কিশোরপ্রিয় গ্রন্থমালা

বুদ্ধ | মহাবীর | কনফুসিয়াস | চন্দ্রগুপ্ত

প্রিয়দর্শী অশোক | শ্রেষ্ঠী সুদত্ত | অতীশ দীপঙ্কর | কবি গোবর্দ্ধনাচার্য

রাজা লক্ষ্মণসেন

জীবন জ্যোতি কথা

ইন্দিরা দেবী

কবি জয়দেব

গুরু নানক

কবীর দাস

একনাথ | সন্ত তুকারাম | যোয়ান অব আর্ক | শ্রীচৈতন্য

স্বামী বিবেকানন্দ | নেপোলিয়ন | নেতাজী | শ্রীঅরবিন্দ

শিবাজী | চিত্তরঞ্জন

জীবন জ্যোতি কথা

ইন্দিরা দেবী

ওরিয়েন্ট লংম্যান

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

ISBN 0 86131 912 5

রেজিস্টার্ড অফিস

৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস

কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট্‌, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২

১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২

১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২

৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪

এস্‌ সি গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১

'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্মৌ ২২৬ ০০১

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯

প্রচ্ছদ : রেসপন্স

চিত্রাঙ্কন : কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রকাশক

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

১৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রক

ট্রায়ো প্রসেস

পি ১২৮ নিউ সি আই টি রোড, কলিকাতা ৭০০ ০১৪

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

জ্ঞানীরা বিন্দুর মধ্যে দেখতে পান সিন্ধুকে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অত প্রখর নয়, তবু তাদের চোখেও কখনও কখনও ধরা পড়ে ছোটখাটো এমনি কত ঘটনা—যাকে ভোলা যায় না—ছোট বলে যাকে উপেক্ষা করার কোন উপায়ই থাকে না।

ইতিহাসের পাতায় সারবন্দী বড় বড় ঘটনার কাহিনী। ছোটখাটো বিষয়ের জন্য ইতিহাসের সোনার তরীতে ঠাঁই নেই। কিন্তু তাদের হারিয়ে যেতে যদি দিই আমরা তাহলে অপচয়ের অপরাধ স্খলন করতে পারব না আমরা—মহাকালের বিচারাসনে যিনি আসীন রয়েছেন তাঁর কাছে। আর তাকে ছোট ঘটনাই বা বলব কী করে ? শুধু সময়ের পরিমাপে ? তাদের ঘটতে বেশি সময় লাগে নি এই অজুহাতে ? শিউলির ডালে পাতার ফাঁকে ফুটে উঠল ফুল—রাত শেষ হবার আগেই ঝরে পড়ল নিচে শিশির ভেজা ঘাসের বুকে। কিন্তু তার রেশ বাতাসের গায়ে, মানুষের মনে লেগে রইল অনেকক্ষণ। স্বল্প মেয়াদী বলে তাকে উপেক্ষা করব ? সূর্যাস্তের শেষ ছটা—কয়েকটি নিটোল মুহূর্ত—তারপর

দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল আকাশের সমুদ্রে—কিন্তু মন থেকে তাকে মুছে ফেলা যায় না।

ছোট ঘটনার পরিধির মধ্যে লুকানো রয়েছে বিরাটের ইঙ্গিত, তারই ছোঁয়া লাগুক আমাদের কিশোরদের মনে। তাদের জন্যই—এই প্রচেষ্টা।

ইন্দিরা দেবী

বুদ্ধ

আত্মীয়-পরিজনের স্নেহচ্ছায়া, রাজকীয় মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের মোহ, অনায়াসলব্ধ বিলাসবৈভব সব তুচ্ছ করে সিদ্ধার্থ একদিন পরম সত্যের সন্ধানে যে মহাযাত্রা করেছিলেন তার সার্থক পরিণতির প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচিত হয়েছিল বোধিদ্রুম মূলে। সত্যানুসন্ধানীর মনে সেদিন অভ্যুদয় ঘটেছিল মহাসত্যের উপলব্ধি— লাভ করে ছিলেন বহু বাঞ্ছিত তত্ত্বজ্ঞান। সিদ্ধার্থ হলেন গৌতম বুদ্ধ শাক্যমুনি।

শাক্যমুনি তাঁর নতুন করে উপলব্ধি করা সত্যকে প্রচার করতে উদ্যত হলেন, যে সত্যের আলোকে তিনি নিজের চিত্তলোক উদ্ভাসিত দেখতে পেলেন, সেই সত্যকে তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। জ্ঞানতপস্বী সাধকের জীবনে সেদিন দেখা গেল কল্যাণব্রতী ভিক্ষু জীবনের সূচনা। নিজের তপস্যাপূত জীবনের শিখা থেকে তিনি প্রজ্জ্বলিত করতে চাইলেন মানব কল্যাণের, সত্য অনুভূতির এক অনির্বাণ দীপ।

শুরু হল তথাগতের পরিক্রমা—নগর থেকে নগরান্তরে। অক্লান্ত অধ্যবসায় সম্বল করে রাজধানী, পল্লী, সর্বত্র পরিক্রমা করে সকল স্তরের

মানুষের কাছে তিনি পৌঁছে দিলেন তাঁর উপলব্ধ সত্যের মর্মবাণী। মৃগদাব, বারাণসী, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, কুশীনগর, কপিলাবস্তু লাভ করল তাঁর পুণ্য চরণস্পর্শ।

মুণ্ডিত-কেশ চীবর-পরিহিত শ্রমণ গৌতম চলেছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যকামী ভক্তশিষ্যের দল। রাজধানীর উপকণ্ঠ সেদিন তাঁর গন্তব্যস্থান। স্বয়ং মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর শরণাগত। রাজধানীর বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ মহাভিক্ষুকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করার সুযোগ পেতে উদ্‌গ্রীব। ধনবান বহু গৃহস্থ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন আকুল আগ্রহ নিয়ে। তবু তথাগত রাজধানীর পথে অগ্রসর হলেন না, তিনি বেছে নিলেন রাজগৃহ নগরীর উপকণ্ঠ।

যত এগিয়ে যাচ্ছেন জনবসতি ততই বিরল হয়ে আসছে। যে পথ দিয়ে চলেছেন বুদ্ধ, তার দু'পাশে বাড়ির সংখ্যা খুব বেশি নয়। এইসব বাড়ির অধিবাসীদের কাছে পৌঁছেছে পরিক্রমার খবর। সকলে দ্বার অবারিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র ভরিয়ে দেবার জন্য।

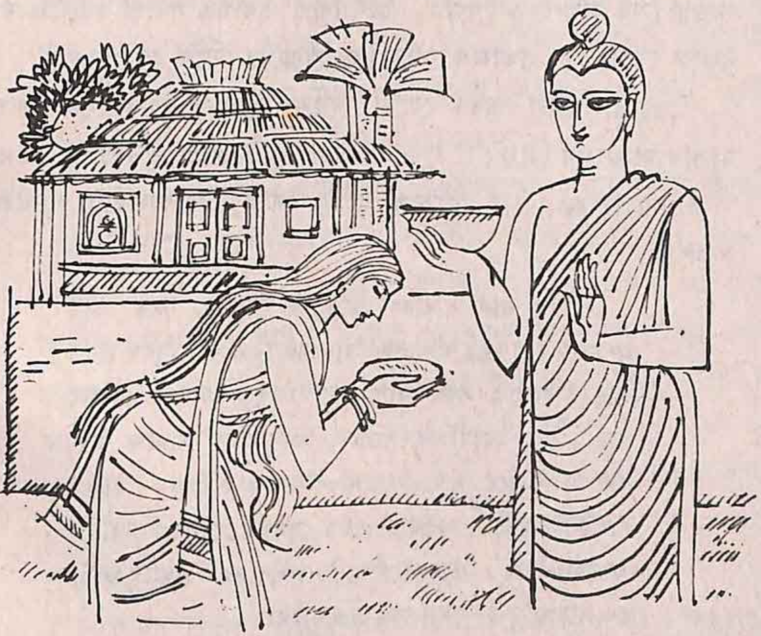
কিন্তু যাঁর প্রতিটি পদচারণা কেন্দ্র করে এই অধীর আগ্রহ, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত সম্মুখপানে — পথ সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে — জনবসতিও নিঃশেষিত প্রায় — ভক্তশিষ্যরা ভাবছে আজ হয়ত ভিক্ষাপাত্র অপূর্ণই থাকবে।

নগরের উপকণ্ঠ যেখানে শস্যক্ষেত্রের অদূরে এসে মিশেছে, জনবসতি যেখানে নিঃশেষিত, তার পাশে একটি ছোট্ট কুটির। চারিদিকে মাটির দেওয়াল। মাথার উপর লতাপাতা ও ঘাসের ছাউনি। সেই কুটিরে বাস করে এক দরিদ্র রমণী — পুণ্যা দাসী। সারাদিন গৃহস্থের বাড়িতে ধানভানার কাজ করে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে আশ্রয়স্থল এই কুটিরটিতে। গৃহস্থের বাড়ি থেকে যা আহার্য জোটে, তা দিয়েই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় — প্রতিদিন কাজ করে আর প্রতিদিন তার বিনিময়ে লাভ করে আহার্য। দিনান্তে কুটিরের বারান্দায় বসে তাকিয়ে থাকে গৃধ্রকূটের দিকে। তার মাথায় বৌদ্ধাবাস। সূর্যালোক স্তিমিত

হওয়ার পর, সেখানকার অন্ধকারের বুক চিরে জেগে ওঠে বুদ্ধশিষ্যদের জ্বালানো দীপশিখা। পুণ্যা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই শিখার দিকে। শীর্ণ হাত তুটি জোড় করে জানায় অন্তরের প্রণতি।

পুণ্যার কুটিরের সামনে দিয়ে চলেছেন গৃধ্রকূটের সেই পরমপ্রিয় মানুষটি। মুখে অবর্ণনীয় প্রশান্তি, দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ছে সুধা, হাতে ভিক্ষাপাত্র। পুণ্যা এক মুহূর্ত মাত্র চেয়ে রইল পলকহীন তুই চোখ মেলে; তারপরই ছুটে এসে পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ল তথাগতের চরণ স্পর্শ করার তুর্জয় লোভে। কিছুক্ষণের জন্য পদচারণা বন্ধ হল; তথাগত আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।

পুণ্যার কি মনে হল কে জানে। সে যেমন দ্রুতগতিতে কুটির থেকে ছুটে এসেছিল, তেমনি দ্রুতগতিতে ফিরে গেল কুটিরে। মুহূর্তের



অবসরে সে ফিরে এল — হাতে অর্ধদগ্ধ একখণ্ড রুটি। ইতস্ততঃ না করে পরম শ্রদ্ধায় আর গভীর স্নেহে সে নিবেদন করল ভিক্ষাপাত্রে। তথাগত প্রসন্নচিত্তে পুণ্যার দান গ্রহণ করে এগিয়ে চললেন।

ততক্ষণে পুণ্যার বিমূঢ় ভাবের অবসান হয়েছে। সে ভাবল কী আস্পর্ধা আমার, যার চরণস্পর্শের জন্য রাজা-রাজড়ারা তাদের মুকুট পরিহিত মস্তক লুটিয়েছেন পথের ধুলোয় যাঁকে সব দিয়েও কিছু দেওয়া হয় না — তাঁকে কিনা আমি দিলাম এক টুকরো পোড়া রুটি! ক্ষোভে দুঃখে এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় পুণ্যা তথাগতের পথ অনুসরণ করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় এক অপূর্ব দৃশ্য। অদূরে এক বিরাট বনস্পতি — তারই ছায়ায় চীবর বিছিয়ে বসেছেন বুদ্ধ। তাঁর নির্দেশে আনন্দ তাঁর হাতে তুলে দিলেন পুণ্যার দেওয়া সেই অর্ধদগ্ধ রুটিখণ্ড। তাই দিয়ে তথাগত সমাপ্ত করলেন তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজন। ভোজন শেষে বুদ্ধ শিষ্যদের ডেকে বললেন—

'তোমরা সর্বদা স্মরণ রেখো, দানের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপিত হয় দাতার মনোভাব দিয়ে।' পুণ্যার মুখে ফুটে উঠল অনির্বচনীয় আনন্দ আর আত্মতৃপ্তি; তার দু'চোখ বেয়ে নেমে এল বাধাহীন আনন্দের অশ্রু।

> সামান্য দান সাধারণ মানুষের হিসাবে, কিন্তু তাই অসামান্য হয়ে ওঠে অসাধারণ মানুষের বিচারে। সর্বস্ব ত্যাগ করে চীবরমাত্র সম্বল করে যে রাজপুত্র একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন মহামুক্তির সন্ধানে, তিনি পরম আনন্দে গ্রহণ করলেন পুণ্যার সামান্য দান — অর্ধদগ্ধ রুটিখণ্ড। দানের সামগ্রীটির পিছনে অন্তর্যামী পুরুষ দেখতে পেলেন দানদাত্রীর অন্তরের ঐশ্বর্য। তাঁর পুণ্যস্পর্শে নবজীবনের মহাদ্বারে উত্তীর্ণ হল সামান্য নারী পুণ্যা অসামান্য মহিমায়।

মহাবীর

রাতের অন্ধকার অনেকখানি ফিকে আর পাতলা হয়ে এসেছে, আকাশের তারাগুলো তখনও জ্বলজ্বল করছে, তবু আগের তুলনায় কিছুটা যেন নিষ্প্রভ। শ্রান্ত মানুষের দল তখনও ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ঘুমভাঙা পাখির ডানা ঝাপ্‌টানোর আওয়াজ।

নগরীর প্রান্তদেশে শমীবৃক্ষের নিচে পাতার শয্যা রচনা করেছেন এক মুণ্ডিতশীর্ষ তরুণ সন্ন্যাসী। সেদিন সন্ধ্যায় পৌঁছেছেন ভিনদেশী এই পরিব্রাজক। কোথাও এক রাত্রির বেশি অবস্থান করেন না। সারাদিন চলে পথে পথে পরিক্রমা, তারপর সূর্যাস্তের পর পথের ধারেই যেখানে হোক বেছে নেন তাঁর রাতের আশ্রয়। দিনের পর দিন চলেছে এই পর্যটন। কত অজানা অচেনা রাজ্য পার হয়ে আজ আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছেন নগরপ্রান্তে। রাতের তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়— সন্ন্যাসী প্রতিদিনের মত সেদিনও উদ্যত হলেন তাঁর পরিক্রমা শুরু করতে। ভূমিশয্যা ছেড়ে দাঁড়িয়ে একবার রাতের আকাশের দিকে তাকালেন ; তারপর সম্মুখে প্রসারিত পথের দিকে পদক্ষেপ করলেন।

কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই সন্ন্যাসী গতি রুদ্ধ করতে বাধ্য

হলেন। তাঁকে ঘিরে এসে দাঁড়াল সশস্ত্র নগরবাসীর দল—তাদের কণ্ঠে আদেশ ধ্বনিত হল : থামো!

পথিক থামলেন। রক্ষীরা চারপাশ থেকে তাঁকে নজরবন্দী করে জিজ্ঞাসা করল : কে তুমি? কী তোমার নাম? সন্ন্যাসী নিরুত্তর। আবার প্রশ্ন হল : কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি? কোথায় তোমার দেশ? কী তোমার পরিচয়? এবারও সন্ন্যাসী নিরুত্তর।

রক্ষীদলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তারা পথিককে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল : জবাব দাও, নইলে তোমায় নিয়ে যাব নগরপালের কাছে—তখন বুঝবে জবাব না দেওয়ার ফ্যাসাদ কত।

যাকে ঘিরে এত প্রশ্নের বাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছে, তিনি কিন্তু নির্বিকার। চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, মুখে নির্বিকার ভাব। রক্ষী দলের কথার জবাব না দিয়ে তিনি আবার পদক্ষেপে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'থামো।' সন্ন্যাসী থামলেন। রক্ষীদলের প্রধান এবার এগিয়ে এসে চেপে ধরলেন তাঁর দু'টি হাত, তারপর রজ্জুবদ্ধ করে তাঁকে নিয়ে চললেন নগরপালের ভবনে।

ক'দিন থেকে নগরে চোরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। প্রতি রাতেই কোন না কোন গৃহস্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই রাজদ্বারে প্রতিকারপ্রার্থী গৃহস্থের ভিড়। রাজা নগরপালের উপর আদেশ জারি করলেন—যে ভাবেই হোক চুরির হিড়িক বন্ধ করতে হবে। অপরাধীকে খুঁজে বার করা চাই, নইলে অকর্মণ্যতার দায়ে শাস্তি পেতে হবে নগরপালকে সব চেয়ে আগে।

রাজার আদেশ পেয়ে নগরপাল রক্ষী ও প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। নিজে রাত জেগে পাহারা দিতে লাগলেন। তবু চুরি বন্ধ হল না, ধরা পড়ল না চোর। আজ কিন্তু রক্ষীদল মহাখুশি। শিকার তাদের হস্তগত। এই ভিনদেশী তরুণটিই সাধু-বেশে 'পাকাচোর অতিশয়'—এই তাদের স্থির বিশ্বাস—লোকটি শাস্তির ভয়ে বোবা হয়ে আছে—এই তাদের ধারণা। নগরপালের হাতে তাঁকে পৌঁছে

দেবার আগেই তারা তার কাছে আদায় করে নেবে অপরাধের স্বীকারোক্তি। কী করে তা আদায় করতে হয় তা তাদের ভাল রকম জানা আছে। তাই সন্ন্যাসীর উপরে চলল নির্দয় প্রহার। সমস্ত দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবু সন্ন্যাসীর মুখে একটি কথাও ফুটল না — আগের মতই তিনি শান্ত, নির্বিকার, অচঞ্চল।

রক্ষীদল ভাবল, আরো কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করতে হবে। একমাত্র নগরপালই সেই ব্যবস্থা করতে পারেন। তাই মহা-উৎসাহে তারা তাঁকে নিয়ে চলল চরম শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে। ক্রমাগত রাতজাগা ও দুশ্চিন্তার ফলে নগরপালের মেজাজ আগে থেকেই বিগড়ে ছিল। এবার রক্ষীদলের অভিযোগ শুনে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন — ভাবলেন, এতদিনে চোরকে পেয়েছি হাতের মুঠোয়, অপরাধ স্বীকার না করে যাবে



কোথায় ? তারপর রক্ষীদের লক্ষ্য করে বললেন — তোমরা সব অপদার্থের দল, এতগুলো লোক মিলে একটা লোকের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারলে না ? এইবার দাঁড়িয়ে দেখ কি করে কাজ হাসিল করতে হয়।

নগরপালের আদেশে ধৃত লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যমঞ্চের কাছে। আদেশ হল, এর গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দাও — শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হলেই বাছাধন অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবেন — গড় গড় করে তখন কথা বার হবে।

নতুন উৎসাহে রক্ষীদল তাদের শিকারকে নিয়ে দাঁড় করালো ফাঁসির মঞ্চে — নিয়ে এল ফাঁস দেবার দড়ি।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! বার বার চেষ্টা করেও সে দড়ি তারা পরাতে পারল না সন্ন্যাসীর গলায় ! যতবার দড়ি গলার কাছে তুলে ধরে, ততবারই তাদের হাত আড়ষ্ট হয়ে যায়। একে একে সবাই চেষ্টা করে বিফল হল। তখন নগরপাল নিজে এগিয়ে এলেন — তুলে নিলেন দড়ি, সন্ন্যাসীর গলায় তা পরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু হাত তাঁরও আড়ষ্ট হয়ে গেল, প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই দড়ি নিয়ে যেতে পারলেন না সাধুপুরুষের গলার কাছে।

এবার তার মনে চৈতন্য হল — তাই তো ? ইনি নিশ্চয় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনও সাধু মহাত্মা — নইলে এমন অঘটন ঘটবে কেন ? অনুতপ্ত হয়ে নগরপাল ও রক্ষীদল লুটিয়ে পড়ল তাঁর পদপ্রান্তে — কিন্তু সন্ন্যাসী এবারও নির্বিকার, অচঞ্চল, আত্মসমাহিত। এর আগেও যখন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হচ্ছিল তাঁর দেহ, তখনও তিনি যেমন ছিলেন নিরুত্তর, নির্বিকার, এবারও ক্ষমাপ্রার্থীর দল যখন তাঁর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল — তখনও তিনি রইলেন তেমনি বিকারহীন, তেমনি নির্বাক।

যে মহাপুরুষের দেহে সেদিন রক্ষীদল আঘাত হেনেছিল, তিনি স্বনামখ্যাত তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান। এই মহামানব সাংসারিক

জীবনের মোহপাশ ছিন্ন করে, আত্মীয় পরিজন আর অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে আত্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যে শুরু করেছিলেন পর্যটন — গ্রহণ করেছিলেন মৌনব্রত। সঙ্কল্পে অটল ছিলেন বলেই তিনি ব্রতভঙ্গ অপেক্ষা শারীরিক নির্যাতনকেই বেছে নিতে পেরেছিলেন — আর সেই জন্যেই ভবিষ্যৎ জীবনে সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী এই সন্ন্যাসীর রূপান্তর ঘটেছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু মহাবীর বর্ধমান রূপে।

মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন যাঁরা, তাঁদের জীবনের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে থাকে ত্যাগ তিতিক্ষার চরম পরীক্ষা। কৃচ্ছ্রসাধনার মহান ব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন মহাবীর বর্ধমান। নির্যাতন আর নিপীড়ন হাসি মুখে মেনে নিয়ে তপস্যার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই মহামানবের কথা আজও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বিশ্বলোক।

কনফুসিয়াস

প্রাচীন চীন তথা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে কনফুসিয়াসের নাম। চীন দেশের সান্টুং প্রদেশের লু অঞ্চলে তাঁর জন্ম। জন্মকাল খ্রীঃপূঃ ৫৫১ অব্দ। আমাদের গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। বুদ্ধের মত তিনিও ছিলেন মহান্ শিক্ষাদাতা।

অনেক বিষয়ে এঁদের দু'জনার চিন্তাধারার মধ্যে আশ্চর্য মিল ছিল। এঁরা কেউই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। নিছক ধর্মীয় তত্ত্বেও এঁদের তেমন আগ্রহ ছিল না। মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদ এঁরা কেউই মানতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে সততার আর সত্যবাদিতার আদর্শ মেনে চলার উপরে এঁরা গুরুত্ব আরোপ করতেন। সাম্প্রদায়িক কোন দৃষ্টিভঙ্গির এঁরা ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

কনফুসিয়াস ধর্ম নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রত্যেকের মধ্যেই সৎবৃত্তি রয়েছে—সেই বৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি অবহিত হয়ে আমরা সব কিছু করি—প্রতি কাজে, প্রতি চিন্তায় যদি আমরা সৎবৃত্তির অনুশীলন করি, যদি আমরা সততার আদর্শকে মেনে চলি, তাহলেই সুন্দর সমাজ আর সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবো।

কনফুসিয়াসের জীবন সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, তা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় এই রকম—জন্মের তিনবছরের মধ্যেই কনফুসিয়াসের বাবার মৃত্যু হয়। মা দুঃখে কষ্টে অভাব অনটনের মধ্যে শিশুটিকে লালন পালন করেন। অভাব অনটন সত্ত্বেও কনফুসিয়াসকে লেখাপড়ার সুযোগ তিনি পুরোমাত্রায় দিয়েছিলেন।

১৭ বছর বয়সে লু'প্রদেশের শাসনকর্তার অধীনে কনফুসিয়াস এক সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। বাজারে যেখানে শস্য বেচাকেনা হত তার তদারকির ভার ছিল তাঁর ওপর। দু'বছর পর সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের নির্দেশে তিনি এক সুলক্ষণা পাত্রীকে বিবাহ করেন। চার বছরের মধ্যে একপুত্র ও দুই কন্যা লাভ করেন।

এবার বাজার তদারকির কাজ ছেড়ে কনফুসিয়াস শিক্ষাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁর দুই প্রভাবশালী ছাত্রের অনুরোধে তিনি চীনের রাজধানীতে এলেন। এখানের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি তাঁর সামনে তুলে ধরল বৃহত্তর জগতের জ্ঞানভাণ্ডার। দিনের বেশির ভাগ সময় তাঁর কেটে যেত গভীর অধ্যয়নে। পড়া-শোনার সঙ্গে তিনি সঙ্গীত চর্চাও করতেন। গান শুনতে শুনতে তিনি এমনি তন্ময় হয়ে যেতেন যে, খাওয়া দাওয়ার কথাও তিনি সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন।

রাজধানীতেই কনফুসিয়াসের পরিচয় ঘটল সে-যুগের আর এক বিখ্যাত শিক্ষাগুরু লাওৎকে'র সঙ্গে। ধর্ম এবং দর্শন নিয়ে এঁদের মধ্যে গভীর আলোচনা হত। এ দু'টি বিষয়ে তাঁদের মতের মিলের চাইতে অমিলই ছিল বেশি। তবু একজন অপরকে শ্রদ্ধা করতেন। খাঁটি গুণীলোকদের মধ্যে মতামতের পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণের পথে তা বাধা সৃষ্টি করে না। কনফুসিয়াস আর লাওৎকে'র মতান্তর কোনদিনই মনান্তরে পরিণতি লাভ করেনি।

লু'তে ফিরে আসার পরে সেখানে ঘটল এক রাষ্ট্রবিপ্লব। যিনি

এতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি বাধ্য হলেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিজের রাজ্য ছেড়ে যেতে। কনফুসিয়াস তাঁর সঙ্গী হলেন। গন্তব্য স্থল নির্দিষ্ট নেই — কোথায় নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে তাও জানা নেই। দিনের পর দিন তাঁরা হেঁটে চলেছেন। যাত্রাপথে কখনও পার হয়ে এগোলে নদী, কখনও বা জঙ্গল। কখনও পাহাড়। এই সময়কার একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি পরবর্তীকালে তাঁর অনুচরদের শুনিয়েছিলেন।

একবার এক পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাত্রীদল এগিয়ে চলেছেন। জনবসতি সেখানে বিরল। ঝোপঝাড় আর জঙ্গল। তারই মাঝে মধ্যে ছোট ছোট জনপদ — বেশির ভাগই চাষী পরিবার। ঐ শুকনো জমিতেই তারা ফসল জন্মায় আর তাতেই মোটামুটিভাবে মিটে যায় তাদের সমস্যা।

একটি গাছের ছায়ায় বসে তাঁরা বিশ্রাম করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবার যাত্রা শুরু করবেন — এই তাঁদের ইচ্ছা।

এমনি সময় অদূরে একটি বাড়ি থেকে ভেসে এল কান্নার রোল। কান্না কিছুতেই থামছে না, নারীকণ্ঠের এই বিলাপ শুনে বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে কনফুসিয়াস তাঁর দলবল নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই বাড়িটির দিকে। সেখানে পেঁৗছে দেখতে পেলেন এক মধ্যবয়সী মহিলা তাঁর ছেলের মৃতদেহ সামনে রেখে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছেন। আগন্তুকদের দেখে একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্য কান্নার বিরতি হল। সেই সুযোগে এগিয়ে কনফুসিয়াস মহিলাটিকে লক্ষ্য করে জানতে চাইলেন মৃত্যুর কারণ। মহিলাটি তখন কান্না ভেজানো গলায় বললেন —

যার মৃতদেহ আগলে বসে আছি সে আমার ছেলে। আজই বাড়ি থেকে ঐ পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, সেখানে বাঘের অতর্কিত আক্রমণে সে সদ্য প্রাণ হারিয়েছে। তার চিৎকার শুনতে পেয়ে গ্রামবাসীরা যখন লাঠি সোটা নিয়ে পেঁৗছেছে, তখন তার দেহে আর প্রাণ নেই। যে কাপড়টি দিয়ে ঢেকে রেখেছি তার দেহ, সেটি সরালেই



দেখতে পাবেন কী বীভৎস ক্ষতচিহ্ন তার দেহের নানা জায়গায়।

কনফুসিয়াস জানতে চাইলেন — ছেলেটির বাবা কোথায়? উত্তরে মহিলাটি বললেন : তার বাবাও এমনি করে আজ ১৭ বছর আগে প্রাণ হারিয়েছেন বাঘের মুখে, এই পাহাড়ের ধারেই। তারপর একটু থেমে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন — শুধুই কি আমার স্বামী? আমার শ্বশুর মশাইও মারা যান কোন রোগে নয়, বিছানায় শুয়ে নয়, বাঘের হাতে তাঁরও এমনিভাবে মৃত্যু ঘটেছিল।

খবর শুনে কনফুসিয়াস ও তাঁর সঙ্গীরা তাজ্জব। কনফুসিয়াস তখন বললেন : এতই যদি বাঘের উৎপাত এখানে, তাহলে মা, এ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি কেন? বাঘের উৎপাত নেই এমনি জায়গার তো অভাব নেই এই অঞ্চলে।

কনফুসিয়াসের প্রশ্নের জবাবে মহিলাটি জানালেন—'এ জায়গা ছেড়ে যাবার কথা ভাবিনি শুধু একটি কারণেই। এ অঞ্চলের শাসকরা অত্যাচারী নয়।'

উত্তর শুনে কনফুসিয়াস স্তম্ভিত।

মহিলাটির কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রাপথে এগিয়ে যেতে যেতে কনফুসিয়াস তাঁর সঙ্গীদের বললেন: 'মহিলাটির কথা তোমরা শুনেছ তো? মনে রেখো, ভারি খাঁটি কথা। বাঘের হিংস্রতার চাইতেও ভয়ঙ্কর শাসকের অত্যাচার। অত্যাচারী শাসক বাঘের চাইতেও বর্জনীয়।'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি শুধুই আবদ্ধ নয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। মানুষের সুখদুঃখের প্রতি যেমন সহৃদয় মমতা, তেমনি তাদের সমস্যা সমাধানে উদ্‌গ্রীব। ক্ষমতালোভী শাসককুলের কাছে 'বিচারের বাণী' কি ভাবে 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে', সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন দার্শনিক-প্রবর কনফুসিয়াস। ক্ষমতার দম্ভ এক শ্রেণীর মানুষকে করে তোলে পশুর চাইতেও নিষ্ঠুর—সেই দানবশক্তির বিরুদ্ধে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

পাহাড়ের ঢালু যেখানে মাটির বুকে এসে মিশেছে, তার আশেপাশে ছোট একটি জনপদ। তার কৌলিন্য বা খ্যাতি কোনটাই নেই। গ্রামের অধিবাসীরা সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত। চাষবাস আর গো-পালন— এই তাদের মুখ্য উপজীবিকা। সকাল থেকে রাত, আবার রাত থেকে সকাল একই ধারায় বয়ে যায় তাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা।

একদিন ভোরবেলা গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রায় দেখা গেল খানিকটা চঞ্চলতা। গ্রামের মধ্যে মানে-মর্যাদায় আর বিষয়-সম্পত্তিতে যিনি প্রধান তাঁর, বাড়ির সংলগ্ন গো-শালায় দেখা গেল কাপড়ের পুঁটুলিতে জড়ানো নবজাত এক শিশু। কাছাকাছি জনমানুষ কেউ নেই— কোথা থেকে এল এই শিশু কেউ জানে না।

ক্রমে সকালের রোদ ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল কৌতূহলী জনতার ভিড়। কিন্তু নবজাতকের কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। গ্রামবাসীরা দূরে থেকে যখন নিজেদের মধ্যে কেবল আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত, কেউ এগিয়ে এসে ছোট শিশুটিকে গ্রহণ করার জন্য উৎসুক নয়,

তখন গো-শালা থেকে বেরিয়ে এল শিংওয়ালা প্রকাণ্ড এক ষাঁড়— গৃহ-স্বামীর পরম প্রিয় 'চণ্ড'। চণ্ডর শিং নাড়ানো আর ফোঁস-ফোঁসানি দেখে জনতা আরো একটু দূরে সরে গেল। চণ্ড শিশুটির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল, মাঝে মাঝে মুখ নিচু করে সকলের অবোধ্য ভাষায় নবজাতককে শোনাল আশ্বাসের বাণী। একটু পরেই গৃহ-স্বামিনী এসে হাজির হলেন। তাঁকে আসতে দেখে জনতা আরো দূরে সরে গেল। মাতৃ-হৃদয়ের সবখানি স্নেহ ঢেলে দিয়ে তিনি অজ্ঞাতনামা শিশুটিকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে— স্থান দিলেন তাকে তাঁর কাছে।

দিনে দিনে শিশু বড় হতে লাগল। গ্রামের সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে শুরু হল তার মেলামেশা। সেদিন সে-গ্রামে পাঠশালায় যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। তাই অন্যান্য বালকদের মত সেও পাঠশালার পরিবর্তে বেছে নিল খেলার মাঠ, গরু চরাবার জায়গা, পাহাড়তলির কাছে ঘেরা সমতলভূমি।

সারা দুপুর ধরে চলে নানা ধরনের খেলাধুলা— বিকেল গড়িয়ে এলেও তার বিরাম নেই। নিত্য নতুন রকমের খেলা। গ্রামের সব ছেলেরাই তাতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সব খেলার নায়ক হল ঐ কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটি। তার আদেশের মধ্যে যেন রাজকীয় ভঙ্গী, চলনে-বলনে কী আভিজাত্য! সবাই মাথা পেতে নেয় তার আদেশ। সবচেয়ে পছন্দ তার লড়াই-এর খেলা। ছেলেদের দুটি দলে ভাগ করে নিয়ে শুরু হয় দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ— কত সেপাই শান্ত্রী জখম হয়, কতজন হয় বন্দী, কতজনের দেহ ছড়িয়ে পড়ে থাকে যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিক ঘিরে। যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যায়, কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটি যে দলের নেতৃত্ব করছিল— সেই দলই হয়েছে জয়ী।

একদিন যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিল এক নতুন আগন্তুক। তার সঙ্গে বিদেশী ছোট একটি ছেলে। খেলার শেষে আগন্তুক কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেটিকে অনুসরণ করে গেলেন তার আশ্রয়দাতার বাড়ি। বললেন, 'আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ,

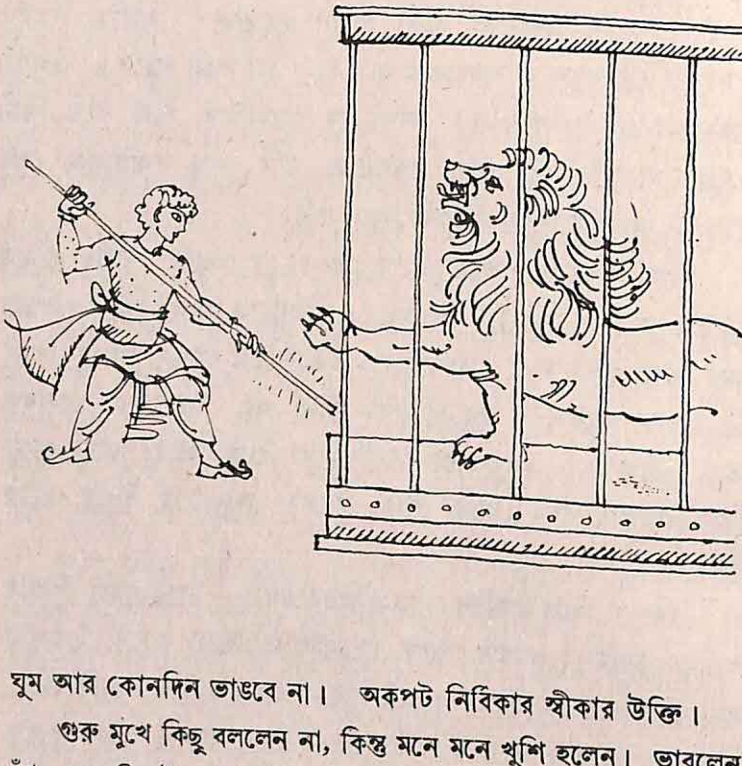
ছেলেটির শিক্ষার দায়িত্ব আমায় দিন, আমি একে কীর্তিমান করে তুলব।'

আগন্তুকের অনুরোধে রাজী হলেন গৃহস্বামী। পরদিন সকালে ছেলেটি তার নতুন আশ্রয়দাতার সঙ্গে চলে এল নতুন শহরে। এখানে শুরু হল তার শিক্ষাজীবন। অপর যে ছেলেটিকে সঙ্গে করে তিনি খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে তাদের লড়াইএর গতি লক্ষ্য করছিলেন, সেই ছেলেটি হল তার শিক্ষা-জীবনের নতুন সঙ্গী।

শিক্ষা-জীবন শুরু করার আগে গুরু তাদের দু'জনের গলায় পরিয়ে দিলেন কাঠের মালা। বললেন, 'এ মালাটিকে কখনই কোন অবস্থায় গলা থেকে খুলবে না।' বহু যত্নে আর পরিশ্রমে আচার্য তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন — শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও তাদের শিক্ষণীয়। শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে গুরু তাদের মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন শহর থেকে খোলা মাঠে। পাহাড়ের উঁচুতে, নদীর তীরে।

তিনজনে মিলে একদিন গেছেন বনের ধারে — দুপুর বেলা বিশ্রাম করছেন সবাই। আচার্য প্রথম ছেলেটিকে ডেকে বললে, 'তোমার সতীর্থের গলা থেকে কাঠের মালাটি খুলে এনে আমায় এখুনি দাও, কিন্তু খবরদার ওকে জাগাতে পারবে না।' গুরুর আদেশ পালন করতে সে চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললে, 'না, আপনার আদেশ পালন করা আমার সাধ্যের বাইরে।' গুরু কোনো কথা বললেন না।

পরদিন দুপুরে নতুন ছেলেটির ওপর জারি করলেন একই আদেশ। ছেলেটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল — হাতে তার অখণ্ড কাঠের মালা। গুরুদেব জানতে চাইলেন — কী করে সম্ভব হল তার আদেশ পালন। ছেলেটি বললে, একটি মাত্র উপায়ে আপনার আদেশ পালন সম্ভব ছিল — আমি সেই একমাত্র উপায়টিই বেছে নিয়েছি। মালাটিকে আমি ছিঁড়িনি। ঘুমন্ত বন্ধুটিকেও জাগাই নি — তবে হ্যাঁ, তার



ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না। অকপট নির্বিকার স্বীকার উক্তি।

গুরু মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে খুশি হলেন। ভাবলেন, হ্যাঁ, একে দিয়েই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে আচার্যদেবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়েছিল—তাঁর সেই সিদ্ধির মূলে ছিল, তাঁর একান্ত শিষ্য এই যুবকের সাধনা।

দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু একই নায়ক, এবার পাহাড়তলির গ্রাম নয়, খাশ রাজধানীর রাজসভা। রাজার ছেলেদের সঙ্গেই চলাফেরা, রাজসভায় কাটাতে হয় সারা সকাল বেলা।

সেদিন রাজসভায় হুলুস্থূল কাণ্ড। সিংহলরাজ পাঠিয়েছেন খাঁচায় বন্দী প্রকাণ্ড এক সিংহ। বলে দিয়েছেন যিনি সিংহটিকে কাবু করতে

পারবেন — তিনিই শ্রেষ্ঠ বীর। রাজকুমারদের ডাক পড়ল — কিন্তু সিংহটিকে কী করে কাবু করা যাবে কেউ ভেবে কিছু স্থির করতে পারলেন না। অত বড় সিংহ, কিন্তু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার এল সেই ছেলেটির পালা। দু'এক মিনিট অপলক চোখে সিংহটিকে দেখে নিয়ে সে চাইল একটি উত্তপ্ত লৌহশলাকা। শলাকাটি পাওয়ামাত্র সিংহের দেহে তা ঢুকিয়ে দেওয়া হল আর দেখতে দেখতে সিংহের অত বড় দেহ গলে নিঃশেষিত হয়ে গেল — কারণ ওটা ছিল মোমের তৈরি — আর সেই ছেলেটি ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারেনি।

এই ছেলেটির মধ্যে সেদিন লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যৎ ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট। তাঁর প্রথম জীবনের কাহিনীর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা। আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী অখণ্ড ভারতের যে আদর্শ একদিন ভারতীয় ঋষিদের চিন্তা-ধারায় প্রেরণা সঞ্চার করেছিল সে আদর্শকে বাস্তব সত্যে রূপায়িত করেছিলেন সাধারণ পরিবেশে প্রতিপালিত এই অসাধারণ পুরুষ।

প্রিয়দর্শী অশোক

চম্পানগরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর ঘর আলো করে ভূমিষ্ঠ হল এক পরমাসুন্দরী কন্যা — দুধে আলতায় মেশানো রং, ঘনকালো চুল, সর্বাঙ্গ ঘিরে অসামান্য সৌন্দর্যের সুষমা। গণৎকার পরীক্ষা করে বলেন, এ সাধারণ মেয়ে নয়, ভবিষ্যতে এর সন্তান হবে অখণ্ড ভারত-রাষ্ট্রের অধীশ্বর। ব্রাহ্মণ সুলক্ষণা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন আর মনে মনে বুনে চলেন স্বপ্নের জাল।

কিশোরী মেয়েকে নিয়ে ব্রাহ্মণ একদিন হাজির হলেন পাটলিপুত্রের রাজ-দরবারে। তাঁর অনুরোধে রাজা নবাগতার স্থান নির্দেশ করলেন রাজ-অন্তঃপুরে। ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে ফিরে গেলেন তাঁর পর্ণকুটিরে। আশঙ্কা আর আনন্দ নিয়ে মেয়েটি প্রবেশ করল রাজ-অন্তঃপুরে। চম্পানগরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহের আলোচ্ছটা এবার উজ্জ্বল করে তুলল মগধের রাজ-অন্তঃপুর। কিছুদিনের মধ্যেই মহাসমারোহে মগধরাজের সঙ্গে বিবাহ হল দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দুহিতা সুভদ্রাঙ্গীর।

বছর দু'বছর অতিক্রান্ত হবার পর — রাণীর একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হল। রাজার জ্যোতিষী গণনা করে বলেন, নবজাতক হবে বিশাল ভারতভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর।

রাজা খুশি হলেন ; কিন্তু একমাস পর সুভদ্রাঙ্গী যখন শিশুপুত্র কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাজার সামনে — রাজা চমকে উঠলেন শিশুর চেহারা দেখে — সুভদ্রাঙ্গীর রূপ কিংবা বর্ণের এতটুকুও ছাপ পড়েনি নবজাতকের দেহে — কুৎসিত, কদর্য তার আকৃতি। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে মাত্র কিছুদিন আগে রাজা যে পরিমাণে পুলক বোধ করেছিলেন, আজ তার কদাকার আকৃতি দেখে রাজার মন সেই পরিমাণে বিতৃষ্ণা আর হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তবু তাঁরই বংশধর — সুতরাং রাজা নিরুপায়। সুভদ্রাঙ্গীর মনে কিন্তু এতটুকু নিরাশার ছোঁয়া লাগেনি। প্রাণপণ যত্নে বুকে করে তিনি শিশুটির লালন পালন করতে লাগলেন।

ক্রমে শিশু বড় হয়ে উঠল — কৈশোর ছেড়ে অতিক্রান্ত হল যৌবনে — রাজপুত্রোচিত শিক্ষা-দীক্ষা তার সমাপ্ত হল, তবু পিতা মগধরাজ তার প্রতি তেমনি নির্বিকার, উদাসীন। ছেলের দুঃখে দুঃখ-বোধ করেন সুভদ্রাঙ্গী, তবু রাজার কাছে জানান না কোন অভিযোগ।

রাজসভায় একদিন দেখা গেল চাঞ্চল্যের লক্ষণ। খবর এসেছে তক্ষশিলার অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে — রাজার সৈন্যদল বারংবার চেষ্টা করেও সে বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি। রাজা পর পর কয়েক দল সামরিক বাহিনী পাঠালেন কিন্তু বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হয়ে তারা ফিরে এল। প্রধান সেনাপতিরা যখন সাফল্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র সবিনয়ে চাইল রাজার কাছে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি। রাজা মঞ্জুর করলেন তার আবেদন। সুভদ্রাঙ্গীর আশীর্বাদ নিয়ে যুবরাজ বেরিয়ে পড়লেন তক্ষশিলার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বিদ্রোহী দল।

বিজয় গৌরবে ফিরে এলেন যুবরাজ। সুভদ্রাঙ্গী পুত্রের গৌরবে মনে মনে গৌরব বোধ করলেন। রাজা তবু তেমনই নির্বিকার উদাসীন। পিতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্র সুমন।

কিছুদিন পরে আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল তক্ষশিলা অঞ্চলে। এবার সৈন্যবাহিনীর পুরোধা হয়ে গেলেন সুমন। কিন্তু বিদ্রোহীদের পরাজয় স্বীকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

মগধরাজ তখন জরাগ্রস্ত — বেশিদিন বাঁচবেন বলে আশা করার উপায় ছিল না। তাঁর একমাত্র চিন্তা সুমনকে কি করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে যাবেন। তাঁর আদেশ নিয়ে সংবাদবাহী চলে গেল তক্ষশিলার শিবিরে — সুমন যেন এখনই রাজধানীতে ফিরে আসে — আর তার জায়গায় যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করুক সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র — এই ছিল রাজকীয় আদেশের মর্ম। কিন্তু মন্ত্রীরা রাজার আদেশ মানতে রাজী হলেন না, মৃত্যুর দ্বারে অপেক্ষমান বৃদ্ধ রাজার আদেশ কার্যকর করে তোলার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না তাঁদের। আর তাঁদের পরামর্শ নিয়ে সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র রাজার আদেশ অমান্য করে রাজধানীতে রয়ে গেলেন ; সুমন পাটলিপুত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের প্ররোচনায় বন্দী হলেন, তাদের মনোনীত সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র অভিষিক্ত হলেন যৌবরাজ্যে। কিছুদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ রাজা প্রাণত্যাগ করলেন — যুবরাজ রূপান্তরিত হলেন সম্রাটে।

সুভদ্রাঙ্গী খুশি হলেও বেশিদিন রাজমাতারূপে গৌরব ভোগ করার উপায় রইল না তাঁর। সিংহাসন লাভ করার পর থেকে তিনি লক্ষ্য করলেন, আকৃতির কদর্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন রাজার প্রকৃতিও নিষ্ঠুর কদর্যতায় ভরে উঠেছে। হিংসা আর রক্তপাতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে তিনি শুরু করেছেন — নরহত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার। তার অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে বলি হল তাঁর আত্মীয়পরিজন, মন্ত্রণাদাতার দল। রাজা নিজের হাতে অনুষ্ঠান করে চলেছেন কত হত্যাকাণ্ড — এ দৃশ্য পরম অনুগত সমর্থক-দলের কাছেও অসহনীয় বলে মনে হল। শেষ পর্যন্ত তাদের অনুরোধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের চরম শাস্তিদানের জন্য মনোনীত হল ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি — চণ্ডাগিরিক। হিংসা আর রক্তপাতে তার অমানুষিক উল্লাস — নিত্য নতুন ধরনের নিষ্ঠুরতা

আবিষ্কারে তার অপরিসীম উৎসাহ — সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব।

সেদিন নগরে প্রবেশ করলেন সৌম্যদর্শন এক তরুণ তাপস — নাম তাঁর বালপণ্ডিত। নগরের দ্বার অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাগিরিকের ভীমদর্শন অনুচরেরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে। তপস্বীকে কিন্তু একটুও বিচলিত দেখা গেল না। চণ্ডাগিরিকের আদেশে তাঁকে নিক্ষেপ করা হল কারাগৃহে। সাতদিন পর তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে বলে জানানো হল। নির্দিষ্ট দিনে তপস্বীকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় নিয়ে তারা এল বধ্যভূমিতে। আগুনের লেলিহান শিখার উপর রয়েছে তপ্ততৈলের কটাহ। চণ্ডাগিরিকের আদেশে তপস্বীকে নিক্ষেপ করা হল সেই জ্বলন্ত আগুনের তৈলপূর্ণ কটাহে। চণ্ডাগিরিক নিষ্ঠুরতার আনন্দ উপভোগ করার জন্য তাকিয়ে রইল কটাহের দিকে — কিন্তু কী



আশ্চর্য ! কোথায় সেই তপ্তৈতেলের পাত্র ? তার জায়গায় ফুটে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম — আর সেই পদ্মের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি !

এই আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনে রাজা নিজে ছুটে এলেন দেখতে। তাঁর চোখের সামনেও উদঘাটিত হল সেই একই অপূর্ব, অকল্পনীয় দৃশ্য। দেখতে দেখতে রূপান্তর ঘটল রাজার। নিষ্ঠুরতার শেষ চিহ্নটুকু গেল মিলিয়ে — তাঁর সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করে দেখা দিল মৈত্রীর পরম প্রসাদ, প্রেমের সঞ্জীবনী স্পর্শ — তপস্বীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল রাজার গর্বোন্নত শির — অনুশোচনার আগুনে পুড়ে লাভ করলেন তিনি নতুন জন্ম — কালাশোক রূপান্তরিত হলেন ধর্মাশোক রূপে।

(অশোকাবদান থেকে গৃহীত)

ক্ষণমুহূর্তের একটি অনুভূতি। অভ্যস্ত জীবনের কেন্দ্র থেকে এতটুকু বিচ্যুতি — তারই স্পর্শ পেয়ে কাঁচ হয় কাঞ্চন — চণ্ডাশোক হয়ে ওঠেন ধর্মাশোক। অভ্যস্ত জীবনের পথে প্রতিদিনকার মতই চলছিলেন মৌর্য সম্রাট — হিংসা আর রক্তপাতে চিহ্নিত হয়ে উঠেছিল তাঁর সাম্রাজ্যগর্বী প্রতিটি পদক্ষেপ — কিন্তু সেই পথেই নেমে এল অমৃতের আলো — দর্শন পেলেন ক্ষমাসুন্দর নিবেদিতপ্রাণ দেবতার। সন্ধান পেলেন মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার উপায়, হিংসার পঙ্ক থেকে জন্ম নিল অহিংসা, প্রেম মৈত্রীর শুচিশুভ্র শতদল।

শ্রেষ্ঠী সুদত্ত

শ্রেষ্ঠীকুল শ্রেষ্ঠ সুদত্ত। তাঁর ধনৈশ্বর্যের তুলনা হয় না। অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সুদত্ত নিরহঙ্কার, নিরভিমানী। জীবনের সব চাইতে বড় ঐশ্বর্য বলতে তিনি বোঝেন ভগবান তথাগতের সান্নিধ্য — তাই সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যান সর্বত্যাগী ভিক্ষাপাত্র সম্বল এই মহাপুরুষটির কাছে। বুদ্ধের পুণ্য স্পর্শধন্য সুদত্তর অর্থের প্রতি নেই কোনো মোহ। পরহিত ব্রতে, আর্তের সেবায়, অকৃপণ দানে এই অর্থ তিনি নিয়োজিত করেন। অনাথের ঝুলি তিনি পূর্ণ করে তোলেন দানের পিণ্ডে — তাই দেশ জুড়ে সুদাতা সুদত্ত নামটি ভুলে গিয়ে সবাই তার নতুন নামকরণ করল অনাথপিণ্ডদ।

অনাথপিণ্ডদের দানের তুলনা হয় না। কিন্তু দানের প্রতিযোগিতায় তাঁকে একদিন হার মানতে হল আর হার মানালেন তাঁরই কন্যা সুপ্রিয়া।

অভিজাত ধনীগৃহের আড়ম্বরে পালিত ছোট মেয়ে সুপ্রিয়া কিন্তু কোনদিনই স্বীকার করে নিতে পারেনি আভিজাত্যের দম্ভ। সন্ধ্যাবেলা প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে তার চোখে ভেসে উঠত নগরের প্রান্তে অবস্থিত

পর্ণকুটিরের ছবি — সেখানে যারা থাকত তাদের জীবন প্রতিনিয়ত হত অভাব অনটনে নিষ্পেষিত। দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জুটত না তাদের। রোগে শোকে পীড়িত হলেও তাদের প্রায় কেউই শোনাতে আসত না সান্ত্বনার বাণী। নিজের প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে ছোট মেয়ে সুপ্রিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত — কখনও তার গাল বেয়ে পড়ত তপ্ত দু'ফোঁটা চোখের জল।

তখন মাত্র কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে। সুপ্রিয়া বাবার কাছে অনুনয় বিনয় করে জানাল তাকে যেন সেবাব্রত গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। বাবা এককথায় রাজী হলেন, বললেন — আমার অর্জিত সমস্ত অর্থ তুমি লোক সেবায় দান কর। কিন্তু সুপ্রিয়ার আবেদন তখন নিঃশেষিত হয়নি। বলল — এ ধনী গৃহে, বিলাস আড়ম্বরের মধ্যে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না, উঁচুতলা থেকে দান করার গৌরব আমি অর্জন করতে



চাই না, আমি নিচুতলায়, সকলের সঙ্গে দীন-দুঃখী-দরিদ্রের মধ্যে তাদের দুঃখশোক আমি ভাগ করে নেব, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের স্বেচ্ছায় দেওয়া সাহায্যে আমি ভরিয়ে তুলব তাদের শূন্যতার ঝুলি।

অনাথপিণ্ডদকে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিতে হল। সুপ্রিয়ার হল নতুন পরিচয় — ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া।

শ্রাবস্তীপুরে দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ — অনাহারে, অর্ধাহারে অসংখ্য নরনারীর চোখে মুখে ঘনিয়ে এল মৃত্যুর করাল ছায়া। সেই মৃত্যু যজ্ঞের মধ্যে আশ্বাস আর নির্ভরতার মূর্তি নিয়ে দাঁড়ালেন ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া। তাঁর হাতে ভিক্ষার ঝুলি। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরান্তরে চলল তাঁর অক্লান্ত, পরিক্রমা। যার যা আছে তাই দাও। আমার ঝুলি পূর্ণ কর — হোক তা এক মুঠি কিন্তু এই মুঠি মুঠি অন্নের মধ্যেই পাওয়া যাবে অমৃতের আস্বাদ, তোমাদের দান দিয়েই আমি করব মৃত্যুকে জয়।

সুপ্রিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল ধনী, নির্ধন, সক্ষম, অক্ষম। সকলের মিলিত দানে ভরে উঠল তাঁর ঝুলি, দূর হল মৃত্যুর করাল ছায়া। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল শ্রাবস্তীপুরের অধিবাসীরা। কোন ঘটা নয়, কোন আতিশয্য নয়। সম্পূর্ণ নিজের একক চেষ্টায় সুপ্রিয়া সেদিন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে-ছিলেন আজকের যুগের সমাজ সেবাব্রতীদের কাছে তা হয়ে রয়েছে আদর্শস্থানীয়।

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।

সুপ্রিয়ার এই বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেবাধর্মের সার্থকতার ইঙ্গিত। সেবার প্রতিযোগিতায় অনাথপিণ্ডদকে পরাজিত করেছিলেন অনাথপিণ্ডদসুতা। এক অনাথপিণ্ডদকে তিনি ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন শত-সহস্র জীবনের মধ্যে, তাই দুর্ভিক্ষের দানব শেষ পর্যন্ত হার মেনেছিল — তাঁর সেবাপরায়ণ আদর্শের কাছে।

দানধ্যানে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছিলেন শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠ সুদত্ত। কিন্তু সুদত্ত-দুহিতা সুপ্রিয়ার দান উত্তীর্ণ হয়েছিল আরও মহত্তর ক্ষেত্রে। ভাগ্যবান ধনীর একক দানে নির্ধনের ভাণ্ডার যদি বা ভরে ওঠে, নির্ধনের মনের দৈন্য তাতে ঘুচে না। দান ব্রতের ক্ষেত্রে সুপ্রিয়া ঘুচিয়ে দিলেন ধনী-নির্ধনের প্রভেদ, মানুষের সাধ্যাতীত দান পেয়ে ভরিয়ে তুললেন তিনি নির্ধনের ঝুলি। জয় করলেন দুর্ভিক্ষের দানবকে। আর ঐক্যবদ্ধ সমবেত চেষ্টায় মানব কল্যাণের ব্রত কতখানি সহজে সার্থক করে তোলা সম্ভব, তার প্রমাণ রেখে গেলেন তাঁর দান যজ্ঞের অনুষ্ঠানে।

অতীশ দীপঙ্কর

ভারতের উত্তরে তিব্বত। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা দেশ। সারা বছর জুড়ে দুরন্ত শীত আর শীতকালে গাছপালা মাটি ঘরবাড়ি সব বরফে ঢাকা। যেন বরফের দেশ। কখনও কদাচিৎ দেখা যায় এই বরফে ঢাকা পাহাড়ী পথে নেমে আসছে আলখাল্লা পরা তিব্বতী বণিকরা ছোট ঘোড়ার পিঠে। লোকের মাথায় মোট-ঘাট — এই সব নিয়ে নিচের দিকে তিব্বতের দক্ষিণে নেপাল রাজ্য পর্যন্ত তাদের নেমে আসতে দেখা যেত — কখনও কখনও নেপাল পার হয়ে ভারতবর্ষের উত্তরের রাজ্যগুলোতেও তারা আসত। এদের দেশে রাজাও ছিলেন আর পাত্র-মিত্র সেপাই শান্ত্রী লোকজন সবই ছিল।

কখনও রাজাদের সখ হত ভারতবর্ষ থেকে লোকজন তাঁদের দেশে বেড়াতে যাবে। ভারতবর্ষের লোকজনদের সভ্যতা, ধর্ম ও রাজনীতির কথা তারা শুনেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না।

হাজার বছর আগে তিব্বতের রাজার ইচ্ছা হয়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রণ করবেন জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতকে। তখন ভারতবর্ষে নামকরা বিদ্যাপীঠ ছিল বিক্রমশীল মহাবিহার। এই বিহারের অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। তিব্বত-রাজ শ্রীজ্ঞানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনেক ধনরত্ন স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দূত পাঠালেন।

ধন-দৌলতের লোভে দীপঙ্করকে আনা যাবে না এ ভুল রাজা বুঝলেন, যখন দূত ফিরে এল।

এ রাজার মৃত্যুর পর নতুন রাজাও চেষ্টা করলেন — এবার শুধু অনুরোধ পত্র এল — ধনদৌলত নয়।

তিব্বতীয় দূতের তিন বছর অপেক্ষা করে থাকার পর দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করলেন।

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন দীপঙ্কর। জন্মেছিলেন গৌড়ের রাজবংশে। পুঁথিপত্র থেকে জানা যায়, যে রাজপ্রাসাদে তিনি জন্মেছিলেন তার আসল-নাম স্বুবর্ণধ্বজ। বাবা কল্যাণশ্রী, মা পদ্মপ্রভা। ছেলেবেলার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ।

একুশ বছর বয়সে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর মনে সুখ ছিল না — আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে থাকত। কৃষ্ণগিরি বিহারের অধ্যক্ষ রাহুল গুপ্তের কাছে তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন ঊনত্রিশ বছর বয়সে। ওদন্তপুরী বিহারে যোগ দিয়ে কয়েক বছর অধ্যয়নের পর 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি পেয়েছিলেন। সে সময় সুবর্ণদ্বীপে মহাচার্য চন্দ্রকীর্তি নামে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করতেন — এঁর মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এশিয়ায় কেউ ছিলেন না। দীপঙ্করের ইচ্ছা ছিল এঁর কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করবেন — কিন্তু সুবর্ণদ্বীপ তো বহু দূরের পথ — বাধা বিঘ্ন অনেক —। কিন্তু সেই ইচ্ছাও তাঁর পূর্ণ হল।

একদল বণিকের সঙ্গে তাঁর যাত্রার সুযোগ ঘটল। তারপর দীর্ঘ বারো বছর অধ্যয়ন করে সিংহল হয়ে সমুদ্র পথে মগধে ফিরে এলেন। দেশের রাজা প্রথম মহীপালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হলেন।

তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে তিনি যাত্রা করলেন। তিব্বতের দূরত্ব

আর পথঘাটের দুর্গমতা কোনটাই তাঁকে বাধা দিতে পারল না। বয়স তখন ষাট। এই রকম পরিণত বয়সে ঘরের বাইরে যাওয়া যেখানে সাহস হয় না—দীপঙ্কর তখন কর্তব্যের আহ্বানে সব বাধা তুচ্ছ করে চললেন। দুর্গম পথের চড়াই-উতরাই ভেঙে দিনের পর দিন যাত্রা চলেছিল। মানস সরোবর, তারপর রাজধানী লাসায়। তিব্বতী লামারা এখানে তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন—এক বৃদ্ধ লামা উঠে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করেই তাঁকে সম্মান দেখান নি। পরে তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না।

দীপঙ্কর যেদিন লাসায় পৌঁছলেন, সেদিন লাসার রাজপ্রাসাদের দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক—ছেলে বুড়ো জোয়ান কেউ বাদ নেই। সকলে ভিড় করেছে তিব্বতের এই মহামান্য অতিথিকে দেখবার



জন্য। মহামান্য অতিথি এর আগে আরও অনেকেই এসেছেন, কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনায় এত লোক কখনও হয়নি।

সেদিন সেই জনতার মধ্যে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটল! ছোট একটি মেয়ে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল। দীপঙ্কর যখন তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন — তখন সে তার একমাত্র অলঙ্কার গলার হারটি খুলে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করল। মেয়েটি একমুহূর্ত আগেও ভাবেনি যে, সে এমনি একটা করবে। তার কাছে যে বস্তুটি সব চেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে মূল্যবান সে সেই জিনিসটিই তাঁকে নিবেদন করল।

বাড়ি ফিরলে বাবা মা দেখলেন মেয়ের গলার হার নেই — ওটিই গরিবের একমাত্র সম্বল। ভর্ৎসনায় জর্জরিত হয়ে মেয়েটি নদীর জলে ঝাঁপ দিল। সারা রাজধানীতে এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল। দীপঙ্কর শশব্যস্তে ছুটে এলেন — মা বাবাকে সান্ত্বনা দিলেন। মেয়েটির শেষ কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করলেন।

কোথাকার একজন বিদেশী তার জন্যে ছোট্ট মেয়েটির মনে যে ব্যাকুলতা, তার কথা দীপঙ্কর নিশ্চয় কোনোদিন ভুলতে পারেন নি।

সার্থকনামা অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। জ্ঞান-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই নিশ্চেষ্ট থাকেননি এই মহাজ্ঞানী পুরুষটি। উপলব্ধ জ্ঞান অকৃপণ হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন সকল শ্রেণীর নরনারীর কাছে। বার্ধক্যে অবনত দেহ, তবু জ্ঞানতপস্বী দীপঙ্কর দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে এলেন ভোটরাজ্যে। তাঁর অনির্বাণ দীপশিখায় আলোকিত হল দুটি প্রতিবেশী রাজ্য। গড়ে উঠল অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক বন্ধন তিব্বত আর ভারতভূমির মধ্যে।

কবি গোবর্ধনাচার্য

ইংলণ্ডের কবিদের মধ্যে একজনকে রাজকবি বলা হয় তা তোমরা হয়ত জানো। রাজা যাকে মনে করেন ইনি কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁকে রাজ-কবি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ইংলণ্ডে এ নিয়ম দু'শো বছর ধরে চলে আসছে।

আমাদের দেশে রাজ-কবি বলে কোনো কবি নেই, কিন্তু ইংলণ্ডে যখন রাজকবি পদের সৃষ্টি হয়নি, তার অনেক আগে থেকে আমাদের দেশের কবিরা রাজার কাছে থেকে প্রচুর সম্মান পেতেন। রাজাদের মধ্যে অনেকেই ভাল ভাল কবিতা লিখতে পারতেন।

সমুদ্রগুপ্তের নাম তোমরা ইতিহাসে পড়েছ। যুদ্ধ করে বহু দেশ জয় করেছিলেন তিনি। সিংহের মত পরাক্রম ছিল বলে তাঁর উপাধি ছিল সিংহ-পরাক্রম। কিন্তু অত বড় যোদ্ধা আর পরাক্রান্ত শাসক হয়েও মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন কবি। তিনি অনেক ভাল ভাল উঁচুদরের কবিতা লিখেছিলেন আর সেইজন্য তাঁর একটি উপাধি ছিল কবি-রাজ — কবিদের মধ্যে রাজা। অন্যান্য রাজারা সবাই কবিতা লিখতে পারতেন না বটে, কিন্তু তাঁরা সবাই কবিদের খুব সম্মান

করতেন — প্রত্যেকের সঙ্গেই বহু জ্ঞানী গুণী কবি থাকতেন। কবিতা লিখে তাঁরা রাজাকে খুশি করতেন আর দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতেন।

রাজার কাছে এঁরা অনুগ্রহ পেতেন বলে যে, এঁরা সবাই অকারণ পঞ্চমুখে রাজার প্রশংসা করতেন তা নয়। কেউ কেউ অবশ্য রাজাকে খুশি করার জন্য তাঁর কীর্তিকলাপ অতিরঞ্জিত করে গেছেন। তিলকে তাল করারও প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন অসাধারণ স্বাধীনচেতা পুরুষ। রাজার অনুগ্রহভাজন হয়েও ন্যায়পথ থেকে বিচ্যুত হতেন না। সত্যের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা রাজার বিরাগভাজন হতেও ইতস্ততঃ করতেন না। লক্ষ্মীর কৃপার চেয়ে সরস্বতীর বরাভয় তাঁদের বেশি কাম্য ছিল।

সেনরাজ লক্ষ্মণসেন ছিলেন মহাপণ্ডিত। যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য, কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল আরো বেশি। তাঁর সভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন দেশ-বিদেশের বহু কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণী লোক। এঁদের প্রত্যেককেই তিনি যথাযোগ্যভাবে সমাদর করতেন। রাজার অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে এঁরাও নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হয়ে থাকতেন।

লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যে একজন ছিলেন গোবর্ধনাচার্য। রাজার কাছ থেকে প্রচুর সম্মান পেয়েও ইনি রাজ-অনুগ্রহ লাভকেই জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করতেন না। অসাধারণ স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন ইনি।

লক্ষ্মণসেনের রাণী বল্লভা। তাঁর ভাই কুমারদত্তের কোনো কাজে-কর্মে মতিগতি ছিল না। মেজাজও ছিল বেপরোয়া। অকারণে লোকজনকে উত্ত্যক্ত করে আনন্দ পেতেন। লোকজনও তাঁর কাজে প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না। ক্রমে তাঁর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলল। কথাটা একদিন রাণী বল্লভার কানে গেল — কিন্তু তিনি কোনো আমলই দিতে চাইলেন না।

কুমারদত্তের মতিভ্রম হল — একদিন তিনি রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত এক সম্পন্ন বণিক গৃহে অত্যাচার শুরু করলেন। ছেলেমেয়ে ছোট-বড় কেউই বাদ থাকল না। পাড়া-প্রতিবেশীরাও রাজার ভয়ে মুখ বুঁজে অত্যাচার সহ্য করল। কিন্তু সহ্য করল না একজন — সে বাড়ির মেয়ে মাধবী। বললেন, দেশে যখন রাজা রয়েছেন তখন এর প্রতিকার চাই — আমি নিজে যাব রাজসভায়।

অনেকেই বারণ করলেন কিন্তু মাধবী কোনো কথাই শুনলেন না। একেবারে মন্ত্রীদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মন্ত্রীরা ধৈর্য ধরে তাঁর অভিযোগ শুনলেন, কিন্তু সব শুনে বললেন, কুমারদত্তের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা নেই আমাদের। মাধবী বললেন, বেশ, আমি রাজার কাছে যাচ্ছি।

পাত্রমিত্র সভাসদ, সভাকবি সকলকে নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন রাজা। এমন সময় মাধবী সেখানে উপস্থিত হলেন। মনে অনেকখানি জোর নিয়ে এসে সভায় ঢুকে কিন্তু সব সাহস হারিয়ে ফেলেন। এর আগে এরকম পূর্ণসভায় তিনি আসেননি। তাঁর এই অপ্রস্তুত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন গোবর্ধনাচার্য। তিনি সস্নেহে বলেন, তুমি কিছু ভয় করো না মা, রাজার কাছে যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তুমি অসঙ্কোচে বল। তুমি নিজে যখন এসেছ, তখন তোমার অভিযোগ সামান্য নয়।

আচার্যের কথা শুনে মাধবী আশ্বস্ত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে রাজা ও সভাসদকে লক্ষ্য করে তাঁর অভিযোগ বলতে লাগলেন।

মাধবী রাজদ্বারে বিচারের প্রার্থনা নিয়ে এসেছেন শুনে কুমারদত্ত খুব ভীত হয়ে তাঁর দিদি রাণী বল্লভার শরণ নিলেন। ভাই-এর শাস্তি হবে একথা বল্লভা কল্পনা করতে পারেন না, তাছাড়া তাঁর ভাই-এর নামে অভিযোগ আনার সাহসই বা কারুর হবে কেন?

মাধবী তাঁর কাহিনী প্রায় শেষ করে এনেছেন, এমন সময় রাজসভায় এসে প্রবেশ করলেন রাণী বল্লভা। সভাসদরা বিস্মিত হলেন।

রাণীরা রাজসভায় আসেন না এমন নয়, কিন্তু সে কদাচিৎ। কখনও কখনও রাজকার্যের প্রয়োজনে হয়তো আসতে হত।

রাজা একমনে মাধবীর কথা শুনছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রাজা বিচারের ফল ঘোষণা করবেন। কুমারদত্ত একপাশে বসে আছেন বল্লভার দিকে তাকিয়ে। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি যখন রাজার এত নিকটাত্মীয়— তখন তাঁর সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা জানবার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে উঠেছেন— এমন সময়ে বল্লভা অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, মহারাজ, আমি বলছি কুমারদত্তের কোনো দোষ নেই, এ অভিযোগ মিথ্যা। মিথ্যা অভিযোগ করে যে রাজার আত্মীয়ের নামে অপবাদ দিচ্ছে, আপনি তার শাস্তিবিধান করে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করুন।



সভাসদরা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, কারণ কুমারদত্তের কুকীর্তির কথা সবাই জানে।

রাজা খুব মুশকিলে পড়লেন। গোবর্ধনাচার্য এক কোণে বসে একবার রাজার মুখের দিকে আর একবার মাধবীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। মাধবীর নিশ্চল মূর্তির দিকে তাকিয়ে আচার্যের মনে হচ্ছিল যেন জগতের সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাধবী এক নীরব প্রতিবাদ।

রাজা তখনও বিচারের ফল ঘোষণা করেননি — এমন সময় রাণী দাঁড়িয়ে মাধবীর প্রতি তর্জনী-নির্দেশ করে তাকে সভাতল হতে বাইরে যেতে আদেশ করলেন।

গোবর্ধনাচার্যের ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি রাজমহিষীর দিকে একবার মাত্র অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দণ্ড ও কমণ্ডলু নিয়ে রাজসভা ত্যাগ করে চললেন। মুখের থমথমে ভাব দেখে কারো কিছু বলার সাহস হল না।

এতক্ষণে রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। রাজ-মর্যাদা ভুলে গিয়ে তিনি ছুটে গেলেন আচার্যকে নিবৃত্ত করবার জন্য। অন্যায় স্বীকার করে আচার্যের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন। তিনি অপরাধীর শাস্তি-বিধান করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আচার্য গোবর্ধনকে রাজসভায় ফিরিয়ে আনলেন!

ব্রাহ্মণের তেজস্বিতায় সেদিন ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হল।

কুমারদত্ত সমুচিত শাস্তি পেলেন। রাজ্যের প্রজারা তাঁর অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। গোবর্ধনাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাদের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল।

বিস্তৃত রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন রাজা, সৈন্য-বাহিনীর নেতৃপদে অধিষ্ঠিত সেনাপতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলপতি — ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী আসন সংরক্ষিত রয়েছে এদের কীর্তিকলাপের প্রশস্তির জন্য। কিন্তু এদের কীর্তির চেয়েও

মহত্তর যাঁদের কীর্তি তাঁদের কথা কখনও কখনও অলিখিত থাকে ইতিহাসের পাতায়। রাজকবি হয়েও রাজার স্থান যিনি ন্যায়ের নিচে নির্দেশ করেছিলেন তিনি মধ্যযুগীয় বাংলার প্রথিতযশা কবি গোবর্ধনাচার্য।

গুরু নানক

পনেরো শতকের মাঝামাঝি। দিল্লীর বাদশাহী তখ্‌ত তখন সুলতান বহলুন মোদীর দখলে। সুলতানীর গৌরব-সূর্য সে সময় অস্তমিত। এককালের সেই বিশাল সাম্রাজ্য তখন ভাঙনের মুখে। ভাঙনের এই গতিরোধ করা বহলুন মোদী কিম্বা তাঁর পরবর্তী বংশধরদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সে সব কথা থাক—আমরা তাঁর রাজত্বকালের একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বলছি।

শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক। বহলুনের রাজ্যলাভ ১৪৫১ খ্রীঃ। নানকের জন্ম তার ১৮ বছর পর ১৪৬৯ সালে। ধনী না হলেও মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে নানক। পরিবারের ভরণ পোষণ চলত কৃষি আর ছোটখাটো ব্যবসায়ের আয় থেকে।

লেখাপড়া শিখে নানক পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগ দেবেন—এই ছিল বাবা কালুবেদীর একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই নানকের লেখাপড়া বিষয়ে এতটুকু ঝোঁক ছিল না। সামনে বই খোলা থাকত। নানক অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন—খোলা আকাশ, মেঘের আনাগোনা, কিম্বা গ্রামের প্রান্তে যেখানে শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল—

সেইদিকে— গাছপালা বিচিত্র ফলমূল আর বিচিত্রতর পাখির ঝাঁকের দিকে। দেখতে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত বালকের কোনো হুঁশ থাকত না।

শেষ পর্যন্ত অনেক বকাবকি আর মারধোরের ভয় দেখানোর পর নানকের হাতে কিছু নগদ টাকাকড়ি দিয়ে ব্যবসা শুরু করার জন্য শহর অঞ্চলে কেনাকাটা করতে পাঠানো হল। কিন্তু টাকা হাতে পেয়ে (গঞ্জে) যাবার পথে সব তিনি বিলিয়ে দিলেন সর্বত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী-দের দান করে। সুতরাং ব্যবসায়ের রুজি-রোজগারের থেকে সংসারের কিছু আয় হবে— বাবার এই আশা অপূর্ণই থেকে গেল।

মা-বাবা দুজনেই ভাবলেন ছেলের বিয়ে দিলে সংসারের প্রতি অনাসক্তি চলে যাবে। সুলক্ষণা পাত্রীর সঙ্গে যথাসময়ে নানকের বিয়ে হল। কিন্তু অবস্থা একটুও বদলাল না। তিনি আগের মতই ঈশ্বর প্রেমে বিভোর। সংসারের প্রতি কোনও মোহই নেই তাঁর।

শেষ পর্যন্ত সংসারের ছোটগণ্ডী ছেড়ে নানক বেরিয়ে এলেন বৃহত্তর জগতের সাড়া পেয়ে। তাঁর সমস্ত চিন্তাজগৎ আচ্ছন্ন করে ছিল একদিকে ঈশ্বর, অপরদিকে মানুষ।

দেশে তখন ঘোর অরাজকতা। মানুষে মানুষে প্রভেদের দেয়াল, ধর্মের নামে অধর্ম, পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ, দুর্বলের প্রতি প্রবলের সদম্ভ অত্যাচার।

দুর্গম পথের যাত্রী নানক— অনির্দেশ্য তাঁর যাত্রা। সঙ্গে বিশ্বস্ত সঙ্গী ও অনুচর মর্দানা, ধর্মে মুসলমান কিন্তু নানকের একান্ত অনুগত। তাঁর হাতে যন্ত্রসঙ্গীত রবাব। মর্দানা গান ভালবাসতেন। তাঁর মধুর কণ্ঠ থেকে বার হয়ে আসা গান যে শুনত সব কাজ ভুলে সে তন্ময় হয়ে যেত সেই প্রাণ-মাতানো গানে। শুধুই কি সুর? গানের কথা-গুলোও সমান প্রাণস্পর্শী। কথার রচয়িতা নানক স্বয়ং— কথা ও সুরের মণিকাঞ্চন যোগ!

সভ মহি জ্যোতি। জ্যোতি হৈ সোই

তিস দৈ চানভিসভ মহি চালনু হোই
গুরুসাক্ষী জ্যোতি পরপটু ছোই।
জো তিসু ভাবৈ সু আরতি হোই।

অর্থাৎ সকল বস্তুর মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে জ্যোতি, সে জ্যোতি, হে প্রভু, তোমারই প্রকাশ। তোমার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, তারকা। গুরু সাক্ষী তার চরণতলে বসে অন্তরে ঘটেছে সেই জ্যোতির প্রকাশ। হে প্রভু! আমি বুঝেছি যা তোমার প্রীতি সম্পাদন করে, তাই তোমার শ্রেষ্ঠ আরতি।

যখন যেখানে যান নানক, সেখানেই গড়ে ওঠে ভক্তের দল। কিন্তু কোনো এক জায়গায় এক নাগাড়ে বেশিদিন থাকতে রাজী নন তিনি। তাই প্রায় অবিরাম তাঁর পদযাত্রা। ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে নানক



এলেন সঈদপুর শহরে। সেখানকার ধনী রইসরা তাঁকে অতিথি হিসাবে পাবার জন্য আগ্রহী। কিন্তু নানক বেছে নিলেন এক দরিদ্র ছুতোর মিস্ত্রির বাড়ি। মিস্ত্রির নাম লালু। শহরের বাইরে এক প্রান্তে তার ছোট কুঁড়ে। খবর পেয়ে দলে দলে বহু লোক নানকের দর্শনের জন্য আসতে লাগল। তাদের আনাগোনায় মুখরিত হয়ে উঠল লালুর কুটির — আর তার আশপাশ।

শহরে বাস করতেন সুবেদার দেওয়ান মালিক ভগো। তাঁর অসাধারণ প্রতাপ, তিনিই যেন ক্ষুদে সুবেদার। এ-হেন ধনী প্রভাব-শালী ব্যক্তির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ না করে নানক লালু মিস্ত্রির মত এক দরিদ্রের বাড়িতে অবস্থান করছেন জেনে মালিক ভগো রাগে অভিমানে ফেটে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী পাঠিয়ে তিনি দরবারে তলব করলেন লালু আর তার অতিথিকে।

ভগো নানকের কাছে জানতে চাইলেন : 'সব বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী ফকির যাঁরা, তাঁরা এই শহরে আসেন, সকলেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁদের যথাযোগ্য সেবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি বহু অর্থব্যয়ে। কিন্তু আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ না করে এই নগণ্য মিস্ত্রির বাড়িটি বেছে নিলেন কেন? এতে কি আমার অপমান করা হল না?'

নানক তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটির জবাব না দিয়ে মিষ্টি হাসি হাসলেন। তাতে ভগোর রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি গলা চড়িয়ে বললেন : 'কথার জবাব দিন, জবাব না দিলে এখান থেকে আপনাকে যেতে দেব না। দেখছি আমায় চিনতে পারেন নি এখনও।'

এবার নানক জবাব দিলেন : 'চিনি বলেই তো আপনার আতিথ্য গ্রহণ না করে এই দীন দরিদ্র লালুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। ঐ লালুই আসল ঐশ্বর্যের মালিক, আপনি নন।'

ভগো এবার আরো রেগে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কথা সরছিল না। নানক বললেন : 'দেওয়ান সাহেব, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

আপনার অতিথিশালা থেকে কিছু খাদ্য এখানে আনার ব্যবস্থা করুন।' তারপর লালুর দিকে তাকিয়ে বললেন : 'ভাই লালু, আমার জন্য আজ এবেলা যা খাবার প্রস্তুত আছে, বাড়ি গিয়ে সে খাবার এখানে নিয়ে এসো!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'রকমের খাবার হাজির। মালিক ভগোর রন্ধনশালা থেকে এল মালপোয়া, পুরী, মিষ্টান্ন। লালুর বাড়ি থেকে এল দু'টুকরো আধপোড়া শুকনো রুটি আর যৎসামান্য সবজি! ভগোর বাড়ির খাবারের তুলনায় নেহাৎই বেমানান।

নানক প্রথমেই তুলে নিলেন ভগোর বাড়ির পাত্র থেকে খাবারের কিছু অংশ। হাতে নিয়ে সেগুলো তিনি নিংড়াতে শুরু করলেন। কি আশ্চর্য। সেই নিঙরানো খাবার থেকে ঝরে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত! তারপর লালুর বাড়ির রুটি হাতে নিয়ে নিঙরাতে শুরু করলেন।

কী আশ্চর্য! যেই নিঙরানো শুরু করলেন, তা থেকে বেরিয়ে এল দুধের ধারা!

যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক। ভগো সঙ্গে সঙ্গে সাধুর পা জড়িয়ে ধরে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলেন। নানক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে লালুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর সাময়িক আস্তানায়।

গরিবের রক্ত শোষণ করে ধনীদের ধন, ধনী লোকের দম্ভ অন্তঃসার-শূন্য — সেদিন নানক তাই বুঝিয়ে দিলেন এই ঘটনার মাধ্যমে। অন্তরের উদারতা আর চরিত্রের বিশুদ্ধতাই মানুষের আসল ঐশ্বর্য্য, এই ছিল নানকের বাণী।

> মানুষের সত্যিকার পরিচয় তার বিত্তের পরিমাণ নয়। কৌলীন্যের জলুস কিম্বা ক্ষমতার আতিশয্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না আসল পরিচয়। অথচ এই সব একান্ত বাহ্যিক জলুস যাঁদের করায়ত্ত, তাঁরাই সমাজে পেত জন প্রাধান্যের স্বীকৃতি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। কিন্তু আসলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা আর সমাজ-সেবার আদর্শে যাঁরা উদ্বুদ্ধ,

তাঁরাই একমাত্র মনুষ্যত্বের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন ——ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এই তত্ত্বটিই প্রমাণিত হয়েছে যুগে যুগে !

রাজা লক্ষ্মণ সেন

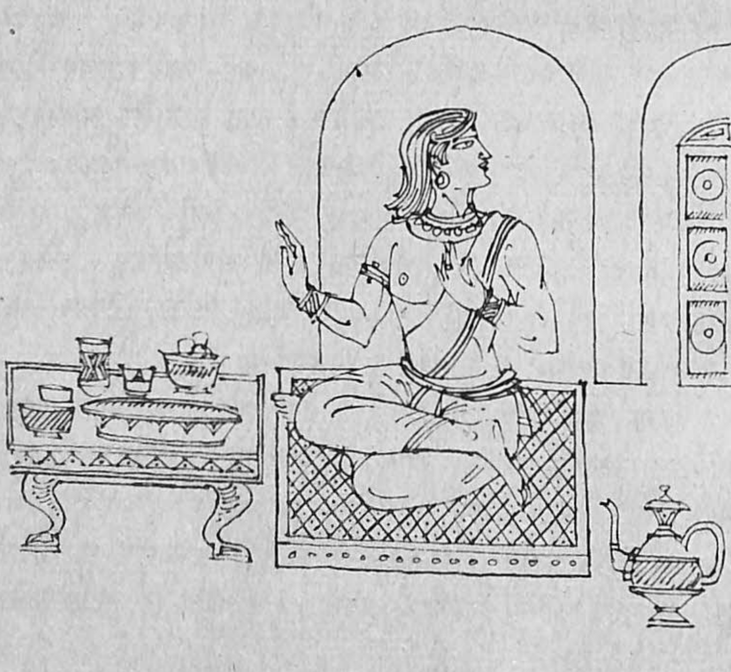
দুপুর বেলা। খানিক আগে রাজসভার অধিবেশন শেষ হয়েছে। সভাসদ্‌রা যাঁর যাঁর গৃহে ফিরে এসেছেন। সকাল থেকে দুপুর অবধি কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে এবার তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন। প্রাসাদে ফিরে এসে রাজা মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসেছেন। এমনি সময় রাজপথ থেকে উঠল তুমুল কোলাহল, শোনা গেল ভীত সন্ত্রস্ত নরনারীর আর্তনাদ; ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ক্রমশঃ নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল।

প্রাসাদরক্ষীরা ত্রস্তব্যস্ত হয়ে রাজাকে সংবাদ দিল, 'মহারাজ, তুর্কী সৈন্যরা নগর ঘিরে ফেলেছে, রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত তারা এগিয়ে এসেছে। নাগরিকরা ভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছে — সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, প্রাসাদ রক্ষা করা সম্ভব নয়।'

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত সংবাদ। রাজা একবার জানালার দিকে তাকিয়ে রাজপথ দেখলেন। প্রাসাদরক্ষীর বর্ণনায় এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। আর কিছুক্ষণ প্রাসাদে অবস্থান করলে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এক মুহূর্তে মনস্থির করলেন রাজা। গঙ্গাতীরে তাঁর প্রাসাদ। তাঁর আদেশে প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বারে কয়েকখানি

নৌকো নিয়ে আসা হল। রাজা এবং রাজপরিবারের সকলে সেই নৌকোয় চড়ে রাজধানী, রাজপ্রাসাদ শত্রুর হাতে ছেড়ে চলে গেলেন পূর্ব বাংলায়। মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী ছিল এই আক্রমণের নায়ক। এদের অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখীন না হতে পেরে যিনি রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের রায় লখ্‌মনিয়া।

লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া বা নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপ কি করে মুসলমানদের অধিকৃত হল তার কাহিনী মুসলমান ঐতিহাসিকরা যে ভাবে বলেছেন, ওপরে তারই সারাংশ বলা হল। তাঁদের মধ্যে যিনি এই ঘটনাটি প্রথম বর্ণনা করেছেন, তাঁর নাম মিনহাজলদ্দীন। নবদ্বীপের পতনের অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পরে তিনি এই ঘটনাটি লিখেছিলেন।



পরের যুগে আরো দু'একজন তাঁকে অনুসরণ করে নবদ্বীপের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এঁদের লেখা অভ্রান্ত মনে করে ঘটনাটিকে ইতিহাসের পাতায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্মণ সেন ছিলেন সেন বংশের রাজা। এঁর পিতামহ এবং পিতা দু'জনেই ছিলেন পরাক্রান্ত রাজা। পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল অধিকার করে এঁরা তাঁদের রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর পিতা বল্লাল সেনকে রাজ্যশাসন ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তারপর বল্লালের মৃত্যুর পর যখন বাংলার সিংহাসন লক্ষ্মণ সেনের করতলগত হল, তখন তিনিও তাঁর পূর্বগামীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর রাজ্যের সীমানা আরো বাড়াতে চেয়েছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায় তিনি কলিঙ্গ, বারাণসী আর প্রয়াগে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া গৌড়, কলিঙ্গ এবং কামরূপের যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অসাধারণ শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সমগ্র আর্যাবর্তের রাজাদের মধ্যে তাঁর মত পরাক্রান্ত রাজা সে যুগে আর কেউ ছিলেন না।

অথচ এমনি একজন শক্তিশালী রাজা মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী সৈনিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারলেন না! নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি রাজধানী ছেড়ে খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন!— এ কথা অবিশ্বাস্য। অথচ নবদ্বীপ সতেরো জন অশ্বারোহী সৈনিক কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, এ খবর ইতিহাসের পাতায় পাকাপাকি স্থান করে নিয়েছে।

ইতিহাসের এ রকম বহু ঘটনা আলোচনা করলে দেখা যায় যে তার মূলে জনশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নেই। অনেক সময় এই জনশ্রুতিই হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাস। লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কেও বহু জনশ্রুতি শোনা যায়। তিনি যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল এবং সে সময়েই তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল — এ রকম একটা কাহিনীও প্রচলিত আছে। এ সব ঘটনা যে বিশ্বাসযোগ্য নয় — এ কথা সবাই

জানে।

কিন্তু নদীয়া অধিকার সম্পর্কে মুসলমান লেখকদের বৃত্তান্ত সমান অসম্ভব হলেও অবিশ্বাস্য বলে বর্জন করা হয় নি। আবার যাঁর সম্বন্ধে এমন কাপুরুষতার কথা বলা হয়েছে তিনিই যে কামরূপ, কলিঙ্গ, প্রয়াগ ও বারাণসীতে তাঁর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, এ কথাও ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করেছেন। এমন একজন পরাক্রমশালী বীর যে নিজের রাজধানী রক্ষা করা দূরে থাক, তার চেষ্টা পর্যন্ত করতে সাহস পান নি — এ কথা বলা ইতিহাসকে অস্বীকার করারই সামিল। ইতিহাস জনশ্রুতির কাছে পরাজয় মানে — এমনি সব বহু ঘটনার মধ্যে এটি একটি।

লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ছেড়ে গেলেও দীর্ঘকাল ধরে সেন রাজারা পূর্ববঙ্গে তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন এ কথা ইতিহাস মেনে নিয়েছে। নদীয়া যে ভাবে মুসলমানরা অধিকার করে নিয়েছিলেন তার মধ্যে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনাকে অনেক বেশি স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানেই ইতিহাসের পরাভব। ইতিহাস নির্বিকার। তার নামে কত যে কাল্পনিক ঘটনা সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে তা গুনে শেষ করা যায় না। সব দেশে, সব কালে, সব যুগে ইতিহাসকে এমনি নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। আজও এ ভোগের শেষ হয় নি। ইতিহাস যেদিন এই সব ক্ষুদ্র ঈর্ষা, স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি পাবে সেদিন হবে সত্যের জয়। সেই দিনই লেখা হবে সত্যিকার ইতিহাস।

বড় খামখেয়ালী ইতিহাস বিধাতা। তার নির্দেশে বিকৃত সত্য কিম্বা অর্ধসত্যকে কখনও সত্যের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে দেখা যায়। বহুকাল থেকে প্রচলিত — শুধু মাত্র এ দাবীতেই ইতিহাস তাকে স্বীকৃতি দেয়। ইতিবৃত্তকারের ভাষণ মুখর হলেও বিধাতার অদৃশ্য লিখনের কাছে তার পরাভব অনিবার্য।

কবি জয়দেব

রাজসভা গমগম করছে, লোক আর ধরে না। এমনিতেই রাজা-রাজড়ার সভায় লোক ধরে না — আজকে একেবারে লোকারণ্য, তিল ধারণের ঠাঁই নেই। রাজ্যে যত গণ্যমান্য সকলেই আজ এই সভায় উপস্থিত। তাছাড়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ও পাত্রমিত্র সভাসদরা আছেন। একপাশে সূক্ষ্ম মসলিনের পর্দা ঝুলছে, তার অন্তরালে অন্তঃপুরিকাদের আসন নির্দিষ্ট হয়েছে — আজ সেখানেও স্থানাভাব। সকলের চোখে-মুখে অধীর আগ্রহ ফুটে উঠেছে।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে স্রোতময়ী ভাগীরথীর তরঙ্গের ওপর অপরাহ্ণ-সূর্যের রঙিন আভা ছড়িয়ে পড়ছে। কর্ম-কোলাহলমুখরিত দিনের অবসানে সর্বত্র একটি গভীর প্রশান্তি। নিস্তব্ধ সভাকক্ষে নদীর মৃদু কলতান ভেসে আসছিল। একটু পরেই সভায় প্রবেশ করলেন মহারাজ লক্ষ্মণ সেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন। রাজা আসন গ্রহণ করলে পর তাঁর অনুমতি নিয়ে সভার কাজ শুরু হল। আজকের সভার প্রধান আকর্ষণ বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীত। সেই কারণেই এত জনসমাগম।

লক্ষণ সেনের সঙ্গীতানুরাগের খ্যাতি বাংলা-বিহারের সীমা অতিক্রম করে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানী, গুণী শিল্পী তাঁর রাজসভায় আসতেন আর রাজার কাছ থেকে সমাদরও পেতেন প্রচুর। নাম-করা বহু শিল্পী স্থায়িভাবে তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন। সেকালে নৃত্যগীত চর্চার খুব প্রচলন ছিল। যাঁরা এই সবের চর্চা করতেন সমাজে তাঁরা সম্মানের আসন পেতেন। এমনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন নটগাঙ্গো। সঙ্গীতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বহু তরুণ-তরুণী তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে সঙ্গীতজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। গাঙ্গোর পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীতপ্রতিভার কথা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল; আজ সেই বিদ্যুৎপ্রভা সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। সুতরাং জনসমাগম হবে তাতে আর বিচিত্র কি?

বিদ্যুৎপ্রভা সভার কেন্দ্রস্থলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। তারপর মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করলেন সঙ্গীত।

ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সভাকক্ষে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রোতারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন এই সঙ্গীত শুনে।

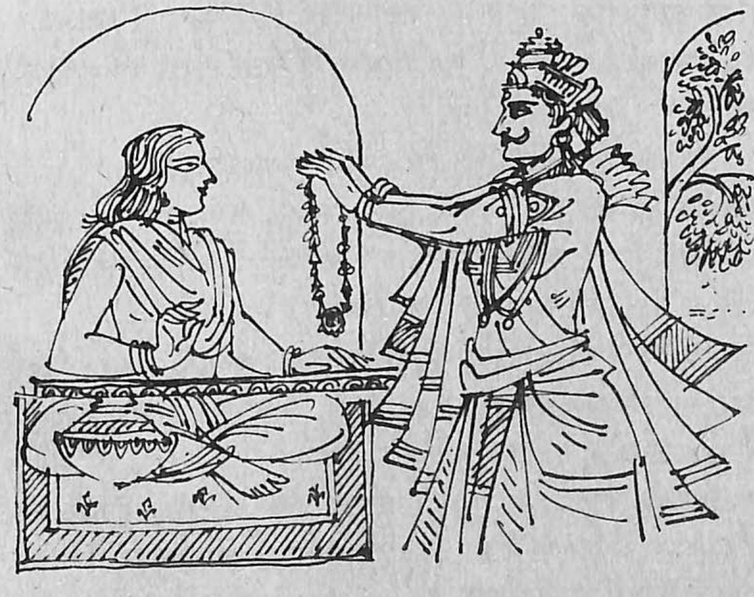
সভাকক্ষে আসবার সৌভাগ্য যাদের হয় নি—এ রকম বহু শ্রোতা কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব সঙ্গীত শুনছিলেন। তাঁদের নিঃস্পন্দ দেহের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল—সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন তাঁরা একে গ্রহণ করছেন।

রাজপ্রাসাদের অদূরে একটি কুয়ো ছিল। মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীরা সেই কুয়োর জল পানীয়রূপে ব্যবহার করতেন। এক বণিক্-বধূ এখানে জল নিতে এসে কিছুক্ষণ এই সঙ্গীত শুনলেন। তারপর তাঁর মনে পড়ল তাঁকে ফিরতে হবে,—তাই তাড়াতাড়ি জল তুলতে গেলেন। বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীত তাঁর মন এ রকম আচ্ছন্ন করে ছিল যে তিনি সব ভুলে কুয়োর মধ্যে কলসী না নামিয়ে কোলের ছেলেটির গলায় দড়ি পরিয়ে জলে নামিয়ে দিলেন! অনেকক্ষণ পরে গান যখন থামল তখন তাঁর

সম্বিৎ ফিরে এল — কিন্তু ছেলের জীবন আর ফিরিয়ে আনা গেল না।

বিদ্যুৎপ্রভা তাঁর সঙ্গীত শেষ করে উঠে এলেন। তারপর এলেন বুঢ়ন মিশ্র। ইনি উড়িষ্যার অধিবাসী। অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ বলে এঁর খ্যাতি সর্বত্র প্রসারিত ছিল। ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করে তিনি তাঁর সঙ্গীত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গুণীজনের কাছ থেকে সমাদর লাভ করেছিলেন। গুণগ্রাহী লক্ষ্মণ সেনের বিশেষ আমন্ত্রণে ইনি রাজসভায় তাঁর সঙ্গীত-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে এসেছেন। বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীতের রেশ তখনও কাটে নি — এমনি সময় রাগ আলাপন আরম্ভ করলেন বুঢ়ন মিশ্র। তিনি বেছে নিলেন পটমঞ্জরী।

মুগ্ধ বিস্ময়ে নিঃস্পন্দ হয়ে শ্রোতারা সেই সঙ্গীত শুনতে লাগল। সভাকক্ষের বাইরে যারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল তারা সবিস্ময়ে দেখল —



প্রাসাদ-অঙ্গনে যে পিপুল গাছ ছিল তার সব পাতাগুলি ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল। সঙ্গীত আরম্ভের পূর্বে যে গাছ ঘন সবুজ পাতায় পূর্ণ ছিল, সঙ্গীত শেষ হবার পরে সে গাছ নিষ্পত্র হয়ে গেল !

বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীত শেষ হবার পর সভাকক্ষ ধ্বনিত হয়েছিল 'সাধু, সাধু' রবে ; কিন্তু বুঢ়ন মিশ্রের সঙ্গীতপ্রতিভা দেখে সভার লোকেরা এত বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন যে সাধুবাদ জানাতেও তাঁরা ভুলে গেলেন। এঁদের নীরব অভিনন্দন সরব অভ্যর্থনার চেয়ে বেশি।

লক্ষ্মণ সেন আসন ছেড়ে গায়ক-শ্রেষ্ঠকে জয়মাল্য পরিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এমনি সময় সভাকক্ষে ব্যস্ত-ত্রস্তপদে প্রবেশ করলেন কবি জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী। ইনি সর্বজনপরিচিত — স্বয়ং মহারাজেরও স্নেহভাজনা। ইনি এগিয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'মহারাজ, আপনি জয়মাল্য দান করার আগে প্রতিযোগিতা শেষ করতে দিন। আমার স্বামীকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত না করা পর্যন্ত জয়মাল্য কারুর প্রাপ্য হতে পারে না।' সভাসদ্‌দের মধ্যে অনেকেই পদ্মাবতীর কথা অনুমোদন করলেন। সভার জনতা প্রতিযোগিতার কথায় আরো উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

জয়দেবকে সংবাদ পাঠান হল, আর, সকলের অনুরোধে, পদ্মাবতী সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। তিনি বেছে নিলেন গান্ধার রাগ। লহরীর পর লহরী তুলে সঙ্গীত বিস্তার হতে লাগল। সঙ্গীতের ধ্বনি কক্ষ অতিক্রম করে প্রতিধ্বনিত হল গঙ্গাবক্ষে।

পদ্মাবতীর সঙ্গীত-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে গঙ্গার ওপারে যে সব নৌকো ছিল সে সবগুলি ভেসে এল এপারে! এই ব্যাপার দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, কারুর মুখে কথা ফুটল না।

তারপর যখন তারা আত্মস্থ হলেন, তখন সভাগৃহ মুখরিত হল অবিমিশ্র অভিনন্দন-বাণীতে। সকলে বললেন, বুঢ়ন মিশ্রের সঙ্গীতের প্রভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়েছে — সে তো সজীব ; কিন্তু পদ্মাবতীর সঙ্গীত-মাধুর্য আকৃষ্ট করেছে নির্জীব নৌকোকে !

পদ্মাবতীর প্রশংসায় যখন সভা মুখর হয়ে উঠেছে — এমন সময় জয়দেব এসে দাঁড়ালেন সভাস্থলে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের কোনো ইচ্ছাই ছিল না তাঁর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদ্মাবতীর অনুরোধে তিনি সঙ্গীত পরিবেশনে সম্মত হলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে সেদিন উৎসারিত হল স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুষমা। এ রকম অপূর্ব সঙ্গীত কেউ কোনোদিন শোনে নি। তিনি আরম্ভ করলেন বসন্ত রাগ — দেখতে দেখতে সেই নিষ্পত্র পিপুল গাছে জেগে উঠল নতুন প্রাণের স্পন্দন, দেখা দিল কচি পাতা ও কুঁড়ি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত গাছ ভরে উঠল সবুজ পাতায়। সভায় জয়ধ্বনি উঠল।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন জয়দেবকে। সে দিনের মত আসর শেষ হল।

সঙ্গীতের আবেদন সর্বত্রগামী — মানুষের মনের রাজ্য পেরিয়ে প্রকৃতির রাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত তার স্বচ্ছন্দ গতি।

কবীর দাস

বারাণসীর গঙ্গার ঘাট। রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। চারিদিকে ঘন কুয়াশা, পথঘাট নির্জন। এমনি সময়ে আচার্য রামানন্দ এসে দাঁড়ালেন ঘাটে — ব্রাহ্মমুহূর্তের আগে স্নান সেরে নেবেন। এক পা এক পা করে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন রামানন্দ। জলের কাছাকাছি সিঁড়িতে পা রেখেছেন, এমনি সময় তার পায়ে লাগল কার দেহের স্পর্শ। মৃতদেহ নয় তো? রামানন্দের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল — রাম! রাম! রাম! যার দেহের স্পর্শ লেগেছিল তাঁর পায়ে, তিনি এক কোণে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। আবছা অন্ধকারে সেই মূর্তিটি পরম শ্রদ্ধায় আনত হয়ে বলল: 'প্রভু, আমি কবীর দাস, আপনার শিষ্য।'

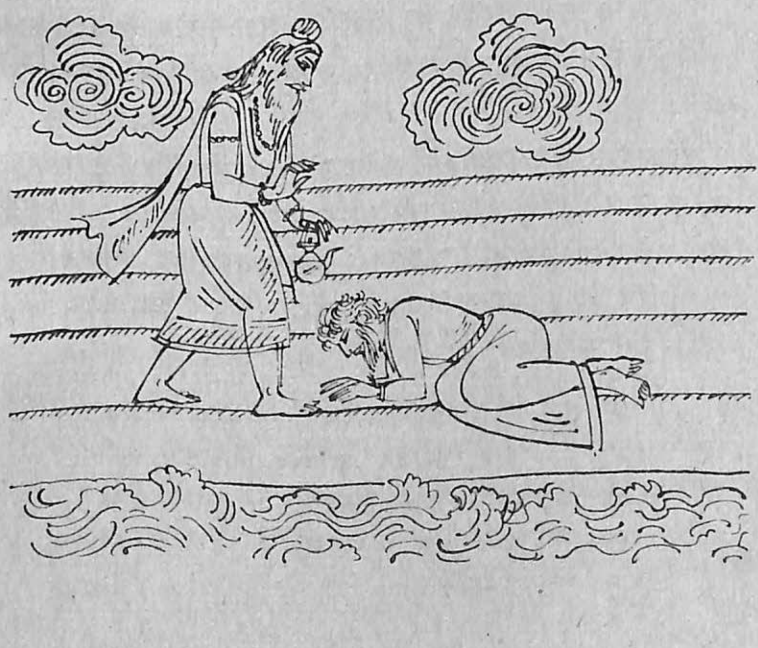
রামানন্দ বললেন: 'সে কি কথা? আমি কবে তোমায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করলাম — তুমি ভুল করছ!'

মাথা নেড়ে কবীর বললেন: 'না প্রভু, ভুল আমার হয়নি। আমি গরিব অস্পৃশ্য জোলা, বন্ধন-দশার মধ্যে থেকে আমি এতদিন মৃতকল্প হয়ে ছিলাম। আজ আপনার পুণ্যস্পর্শে নতুন জীবন পেলাম আমি।

বন্ধন-দশার অবসানে লাভ করলাম মুক্তি, আপনার কাছে পেলাম আমার নাম-দীক্ষা।'

রামানন্দ হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন। কবীর ছিলেন ধর্মের প্রচারক—মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য স্বীকার করতেন না তিনি। ধর্মের জাঁকজমক আড়ম্বর সহ্য হত না তাঁর। মন্দির, মসজিদ, শাস্ত্রাচার আর বাইরের জীবনের ভেদ-বিভেদ এসব তুচ্ছ করে তিনি মানুষের ভালবাসার মধ্যে খুঁজে পেতেন জীবনের চরম সার্থকতা। কোনো পার্থিব শক্তিকেই তিনি ভয় করতেন না—তাঁর জীবনের একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়।

দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লোদী সেবার জৌনপুরে এসেছেন। কবীর প্রচলিত সমাজব্যবস্থা আইন-কানুন কিছুই মানেন না। ধর্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করেন—এসব খবর বাদশাহের



কানে পৌঁছেছিল। তাই তাঁর ডাক পড়ল দরবারে। বাদশা বললেন, 'কবীর দাস, তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। মুসলমান জোলার ঘরে তোমার জন্ম— তবু তুমি ধর্মের কোনো অনুশাসনই নাকি মানো না। তুমি কি স্বধর্ম ত্যাগ করেছ?'

কবীর উত্তর দিলেন: 'জাঁহাপনা, আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, আমার দেশ হচ্ছে অমরধাম, সেখানে জাতের বিচার নেই, আমার কাজ হচ্ছে সে দেশের খবর সকলকে পৌঁছে দেওয়া।' বাদশা কিছু বলার আগে তাঁর এক সভাসদ গর্জে উঠলেন: 'থামো কবীর! তোমার দুঃসাহস আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে, কি আস্পর্ধা তোমার! বাদশাহের মুখের উপর এ কথাগুলো বলতে একটুও ভয় করল না তোমার?'

কবীরদাস একটু হেসে বললেন:

কবীরা কাহাকো ডরে, শিরপর সৃজন হার।
হস্তী চঢ়ী ডরিয়ে নহী, কুতিয়া ভুখে হাজার।

অর্থাৎ কবীর কাউকেই ভয় করে না, তার মাথার উপর আছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হাতিতে চড়ে যে যাচ্ছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ তার কি করবে?

বাদশাহ ছিলেন বুদ্ধিমান। কবীর দাসের মনের খবর তাঁর অজানা ছিল না। সভাসদদের উত্তেজনা থামিয়ে তিনি কবীরকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, রাজশক্তির ভয় দেখিয়ে এই সিদ্ধপুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ভগবানে বিশ্বাস যাঁর আছে, তিনি নির্ভয়, তিনি স্বাধীন।

ভগবান যাঁর শরণ মনন, মর্ত্যের রাজশক্তিকে অবহেলা করার সাধ্য তাঁর সহজাত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর জয় করেছিলেন সন্ত কবীর— তাই মানুষের অন্তরে তাঁর পুণ্য স্মৃতি বহু-যুগের বাধা অতিক্রম করে আজও অম্লান, জ্যোতির্ময়।

সিদ্ধপুরুষ একনাথ

স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী। তারই তীরে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নগর। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের কথা। প্রতিষ্ঠান নগরের খ্যাতি তখন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ধনবান লোকের বাসভূমি বলে নয়, বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র রূপে তখন প্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধি।

জনবহুল নগরের এক প্রান্তে নদীর ধারে ছোট একখানি কুটির। তাতে আভিজাত্যের কোন চিহ্নই নেই, বিলাস-বাহুল্য তো দূরের কথা। খড়ে ছাওয়া মাটির দেওয়াল-ঘেরা কুটির। কিন্তু তার সর্বত্র নিখুঁত পারিপাট্যের পরিচয়। পরিষ্কার ঝকঝকে প্রাঙ্গণ, তার একধারে ফুলের বাগান, সৌখিন মরশুমী ফুল নয়—সাধারণ, কিন্তু বহু দেবভোগ্য ফুল ফুটে রয়েছে স্তরের পর স্তরে। বাতাসে ভেসে আসে তার মিষ্টি গন্ধ। নদীর কলতান আর ফুলের গন্ধ মিলে স্বষ্টি করে এক পরম তৃপ্তির পরিবেশ। অঙ্গনের অপর প্রান্তে তুলসী গাছ। প্রতিদিন সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জেগে ওঠে ভীরু বিনম্র একটি দীপশিখা। তারপর শুরু হয় মধুর ভাববিহ্বল কণ্ঠে অপূর্ব নাম-কীর্তন। ভগবানের আরাধনায় মুখরিত হয়ে ওঠে কুটিরের প্রাঙ্গণ। দলে দলে

নর-নারী এসে যোগ দেন সেই কীর্তন সভায়। মুখে তাদের তৃপ্তির প্রসন্নতা। চোখের কোণে আনন্দের জলধারা।

সেদিন বিকাল হতে না হতেই আকাশ ঘিরে শুরু হল মেঘের আনাগোনা। বাতাসের বুকে জেগে উঠল মত্ততার দাপাদাপি! সন্ধ্যার ছায়া ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলল মেঘ-হাওয়ার মাতামাতি— তবু প্রতিদিনকার মত তুলসীমঞ্চের জমাট অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠল নিটোল দীপের শিখা। ক্ষণকালের মধ্যেই ভেসে এল ভক্তকণ্ঠ থেকে উৎসারিত সুরের লহরী — মেঘের দলের মধ্যেও যেন দেখা গেল নিশ্চল জড়তার লক্ষণ।

যথাসময়ে কীর্তন-সভার অধিবেশন শেষ হল। সমবেত ভক্তরা তাদের শেষ প্রণাম নিবেদন করে ফিরে গেলেন নিজ নিজ ঘরে। তারপর থেকে শুরু হল অবিরাম ধারায় বৃষ্টিপাত— আকাশের বুক চিরে নেমে এল অশান্ত প্লাবন— ভেসে গেল নিচের মাটি। কূল ছাপিয়ে খরস্রোতে ধেয়ে এল গোদাবরীর জলধারা। পরদিন সকালেও বিরাম হল না বৃষ্টির। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা এল— তখনও চলছে একটানা বৃষ্টির ছপাছপ শব্দ। তবু সেদিনও তুলসীমঞ্চ ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রদীপের আলোয়। কুটিরের মুক্তদ্বার থেকে প্রবাহিত হল সঙ্গীতের সুরলহরী। আজ ভক্তসমাগম কম, কিন্তু ভক্তির স্রোতে নেই কোনো ভাঁটা।

রাত্রির দ্বিপ্রহরে কীর্তন সাঙ্গ হল। কুটিরবাসী দু'টি মাত্র প্রাণী সেদিন অনাহারেই কাটালেন। প্রাঙ্গণ ঘিরে থৈ থৈ জল; শুকনো কাঠ-খড়ও ভিজে একাকার। উনান জ্বালানো সম্ভব নয়, তাই সেদিন বিগ্রহের পাদোদক সেবন করেই তাঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন।

গভীর রাত্রে কুটিরের বাইরে শোনা গেল ছপ ছপ পায়ের শব্দ— মানুষের কণ্ঠস্বর! উৎকর্ণ হলেন গৃহস্বামী। তারপর পদশব্দ যখন কুটির লক্ষ্য করে ক্রমশঃ এগিয়ে এল, দ্বারমুক্ত করে আলো হাতে তিনি দাঁড়ালেন— দেখলেন, ভিন্ন দেশীয় তিনটি ব্রাহ্মণ সিক্তবস্ত্রে দাঁড়িয়ে তার



গৃহে আশ্রয় ও আতিথ্য কামনায়। গৃহস্বামী তাদের জানালেন আন্তরিক অভ্যর্থনা — নারায়ণ জ্ঞানে অতিথিদের নিয়ে এলেন তাদের একটি মাত্র শয়নগৃহে। অতিথিরা বহু চেষ্টা করেও কোথাও আশ্রয় পাননি, তাই শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছেন আতিথ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায়। সে আকাঙ্ক্ষা তাঁদের পূরণ হল। প্রথমেই তাঁদের সিক্তবস্ত্র পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করলেন গৃহস্বামী, তারপর সহধর্মিণীর সঙ্গে একটুক্ষণ কী যেন পরামর্শ করলেন।

শয়নগৃহে ছিল একটি মাত্র চার পাই — গৃহস্বামী সেই চারপাইটা বারান্দায় বার করে তার কাঠ থেকে সংগ্রহ করলেন জ্বালানী। গৃহকর্ত্রী সেই জ্বালানীর সাহায্যে জল গরম করে অতিথিদের স্নানের ব্যবস্থা করলেন। তারপর পরম যত্নে তাঁদের জন্য প্রস্তুত করলেন আহার্য।

অতিথিরা এই অভাবিতপূর্ব সেবাযত্ন পেয়ে সেদিন যতখানি বিব্রত বোধ করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি বোধ করেছিলেন পরিতৃপ্তি।

দরিদ্র কুটিরবাসী যে মহাত্মা সেদিন অতিথির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নারায়ণ, মনের মধ্যে দেখেছিলেন জনার্দন—তিনি মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ধর্মগুরু একনাথ।

জীব আর শিব যাঁর কাছে অভিন্ন, নরের মধ্যে যিনি নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করেন, তিনি মহাত্মা—এই মহাত্মাদের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ একনাথ।

সন্ত তুকারাম

চৈতন্যদেব যখন আমাদের দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন এবং তারপরেও দেড়শো বছর ধরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অনেক সাধুসন্ত মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে, ধর্মের গ্লানি যখন উপস্থিত হয় তখনি মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে থাকে। আজ থেকে চার-পাঁচশো বছর আগে আমাদের দেশের ধর্মজীবনে অনেক গ্লানি দেখা গিয়েছিল। আর হয়ত সেই কারণেই মহাপুরুষরাও আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে যুগের মহাপুরুষদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান সন্ত তুকারাম।

এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল কিন্তু অল্পবয়স থেকে তুকারাম জাতিভেদ প্রথাকে অন্যায় বলে মনে করতেন। তাই সমাজে যারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণী বলে অবজ্ঞাত হত তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে চাইতেন। সমাজে অনুন্নত বলে নগরের মধ্যে যাদের বাস করার অধিকার দেওয়া হত না, শহর থেকে দূরে যাদের বাস করতে হত, যাদের ছায়া মাড়ালেও দেহ অশুচি হয় বলে শিক্ষিত (?) লোকের ধারণা ছিল, সেইসব অবহেলিত

জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন তুকারাম। সমাজের নেতারা এটা পছন্দ করতেন না এবং তাঁদের ভয়ে বাড়ির লোকেরাও তুকারামকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বারণ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তুকারাম তাতে একটুও কর্ণপাত করলেন না। তাঁর ওপর নানারকম ভাবে নির্যাতন চলতে লাগল। শুধু তুকারাম নয় — তাঁর সমগ্র পরিবারকে নির্যাতন ভোগ করতে হল। কিন্তু পরিবারের লোকেরা তুকারামকে ছাড়তে চাইলেন না আর তুকারামও তাঁর চালচলন বদলাতে রাজী হলেন না — শেষ পর্যন্ত শহরের নেতারা, সমাজের মাতব্বররা হাল ছেড়ে দিলেন।

সংসারের দিকে তুকারামের মন বসে না। দিনরাত শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করেন আর আপন মনে বসে বসে ভাবেন। এইরকম ভাবে চললে কদিন সংসার চলতে পারে? কিছুদিনের মধ্যে অভাব অনটন দেখা যেতে লাগল, তবু তুকারামের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন আর তাঁকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায় না — তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ভগবানের নাম কীর্তন করেন। মধুর কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর — সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে তিনি যখন গান করতেন তখন শ্রোতার দল নীরব নিঃস্পন্দ হয়ে বহুক্ষণ ধরে নাম কীর্তন শুনত। ক্রমে তুকারামের কীর্তনের খ্যাতি সারা মহারাষ্ট্রে প্রচারিত হল। যখন যেখান থেকে অনুরোধ আসত তুকারাম তা গ্রহণ করতেন, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সংসার কিভাবে চলবে, সে কথা একবারও ভাবতেন না। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলে কোনো জবাবই দিতেন না, তারপর নিঃশব্দে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাতেন।

তুকারামকে কেউ কোনোদিন রাগ করতে দেখেনি, দুঃখ, কষ্ট, অভাব অনটনে তাঁর মুখের হাসি কোনওদিন মিলিয়ে যেতে দেখেনি। কোন বিষয়েই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। এই সম্পর্কে মহারাষ্ট্রের লোকসাহিত্যে দু'টি একটি কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়।

একদিন এক কন্যাদায়গ্রস্ত বিদেশী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলেন। বহুকষ্টে তিনি তাঁর কন্যার জন্যে পাত্র জোগাড় করেছেন— বিবাহের দিনও স্থির হয়েছে কিন্তু আরো দু'শো টাকা সংগ্রহ করা দরকার। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও ফল হয়নি— তাই ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।

ব্রাহ্মণেরা তাঁর কথা শুনে বললেন : 'আমরা একটি সর্তে আপনাকে দু'শো মুদ্রা দান করতে পারি।'

ব্রাহ্মণ আশান্বিত হয়ে বললেন : 'কি সেই সর্ত ? মানুষের যদি সাধ্যায়ত্ত হয় আমি নিশ্চয় তা পালন করব।'

ব্রাহ্মণেরা তাঁর কানে কানে কি সব বললেন— তারপর সেদিন রাত দুপুরে তুকারামের ঘরে করাঘাত শোনা গেল। সেদিন তুকারাম



গৃহেই ছিলেন। সমস্ত দিন ধরে বৃষ্টিপাত হয়েছে — ঘরে যা কিছু জ্বালানী কাঠ ছিল বহুকষ্টে তার সাহায্যে রান্না করে স্বামী-স্ত্রী মাত্র কিছুক্ষণ আগে শয্যাগ্রহণ করেছেন। এমনি সময়ে দ্বারে করাঘাত হল — নিশ্চয় কোনো আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন অতিথি। তুকারাম দ্বার খুললেন — সামনে বিদেশী ব্রাহ্মণ! সে রাত্রিটুকুর মত আহার্য ও বিশ্রাম চাই তার।

তুকারাম অতিথিকে সাদরে গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন — কিন্তু অতিথির ব্যবহারে কোনওরকম ভদ্রতার ছাপ দেখা গেল না। রান্না করে যখন আহার্য পরিবেশন করা হল, তখন অতিথি আসন গ্রহণ না করে তুকারামের স্ত্রী যখন পরিবেশন করছিলেন তখন তাঁর পিঠে চড়ে বসল।

তুকারাম বিস্ময়ে হতবাক — বুঝলেন, তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। তিনি গৃহিণীকে লক্ষ্য করে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন: 'দেখো যেন ব্রাহ্মণ পড়ে গিয়ে আঘাত না পান।' তুকারামের গৃহিণীও স্বামীর আদেশে অনুপ্রাণিত। তিনি স্বামীর কথার উত্তরে বললেন: 'হরিকে কত কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি — কোনোদিন তো পড়ে যায়নি।' হরি তাঁদের ছেলে।

ব্রাহ্মণ আহারে বসলেন — স্বামী স্ত্রী দু'জনে বসে থেকে পরম যত্নে তাঁকে খাওয়ালেন। অতিথি এরকম ব্যবহার আশা করা দূরের কথা, কল্পনা করতেও পারেন নি।

পরদিন সকাল বেলা তিনি যখন তুকারাম ও তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন তখন আপনা থেকে তাঁর মাথা নুয়ে এল। তিনি তুকারামের পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন: 'আমি আপনাদের কাছে গুরুতর অপরাধ করেছি — কিন্তু কই, আপনি তো আমার কাছে জানতে চাইলেন না — কি কারণে আমি ঐরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছিলুম?' তুকারাম কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। ব্রাহ্মণ তখন নিজে থেকেই বলতে লাগলেন: 'ব্রাহ্মণরা আমাকে বলেছিলেন

— যদি কোনোরকমে আপনার ধৈর্যচুতি ঘটাতে পারি, তাহলে তাঁরা আমায় দু'শো টাকা পুরস্কার দেবেন এবং এই দু'শো টাকা পেলে আমি কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেতে পারি।'

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হতে না হতে তুকারাম হেসে উঠলেন: বললেন: 'আগে বলতে হয় — তাহলে আপনাকে দু'শো টাকা পাইয়ে দিতে পারতাম, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে। যাই হোক, আমার যা সামান্য আছে তাই আপনি গ্রহণ করে আমায় অতিথি সেবার পুণ্য অর্জন করতে সুযোগ দিন।'

ব্রাহ্মণ কিছুতেই এ দান গ্রহণ করতে রাজী নন — কিন্তু তুকারামও গ্রহণ না করিয়ে ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে রাজী হতে হল — তারপর তুকারামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রাহ্মণ শেষে চলে এলেন নিজের গ্রামে। তুকারামের সব গ্রামবাসী ব্রাহ্মণরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিলেন — কিন্তু অতিথি তাঁদের কাছে এলেন না। কারণ তিনি ভেবেছিলেন মহাপুরুষের পাদস্পর্শ করে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন — সেইটিই হবে তাঁর সব সেরা সঞ্চয়।

পুঁথিপত্রে গুরুজনদের মুখে ছড়িয়ে থাকে উপদেশের মালা। সবাই পড়ে, সবাই শোনে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে কজন। তুকারাম এমনি দুর্লভ মানুষ যাঁর জীবনের মধ্যে ঘটেছিল উপদেশ বাণীর সার্থক প্রতিফলন — জীবন আর বাণী তাঁর মধ্যে একীভূত হয়ে গিয়েছিল।

যোয়ান অব আর্ক

১৪৩০ সালের ২৩শে মে। রঙ বেরঙ-এর পোশাক পরা হোমরাচোমরা প্রধান কর্তৃস্থানীয় পাদ্রীরা সমবেত হয়েছেন ফ্রান্সের রুয়েঁ শহরে। শহরটি ফ্রান্সের বটে কিন্তু সাময়িকভাবে তাদের প্রতিপক্ষ ইংরেজদের দখলে। অনেকদিন ধরে ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে চলছিল একটানা যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের সুবাদে রুয়েঁ শহরটি তখন ইংরেজ সামরিক বাহিনীর অধীনে।

নিস্তব্ধ সভা। পাদ্রীদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে অধর্মের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক একটা চরম ব্যবস্থা নেবার জন্যেই তাঁরা মিলিত হয়েছেন। এ যেন সাধারণ আলোচনা সভা নয়, বিচার সভা। তাঁদের বিচারের উপরেই নির্ভর করছে ধর্মের পবিত্রতা — চার্চের নেতৃত্ব। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা। অধীর আগ্রহে তাঁরা প্রতীক্ষা করছেন তাঁদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগটি নিয়ে।

এমন সময় শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন। সভাগৃহের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন একদল সশস্ত্র রক্ষী। তারা ঘিরে রেখেছে একজন কিশোরী বন্দিনীকে। বলদৃপ্ত ভঙ্গীতে কিশোরী দৃঢ় পদক্ষেপে সভাগৃহে রক্ষীদের

পাহারাধীন অবস্থায় মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন বিচারক-মণ্ডলীর সামনে। বয়স মাত্র কুড়ি। চেহারার মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ, চোখে মুখে আশ্চর্য দীপ্তি আর প্রশান্তি। যোয়ান অব আর্ক (Jeanne D' Arc) — নামে পরিচিত এই তরুণী।

যোয়ানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ — প্রচলিত ধর্মের বিরোধী বিশ্বাস তিনি পোষণ করেন। তিনি ঈশ্বর-বিরোধী শক্তির কাছে আত্ম বিক্রয় করেছেন। পাদ্রীদের ক্ষমতার তিনি তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের ডিঙিয়ে তিনি সরাসরি আবেদন জানান স্বয়ং ঈশ্বরকে এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের কথাগুলো তিনি ঈশ্বরের বাণী বলে প্রচার করেন। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে আরো এক অভিযোগ — তিনি পুরুষের পোশাক পরে সমগ্র নারীজাতির অবমাননা করেছেন।

বিচারক পাদ্রীরা সংখ্যায় চল্লিশ — যেভাবেই হোক যোয়ানের শাস্তিবিধান করতেই হবে — এই ছিল তাঁদের সম্মিলিত সঙ্কল্প। তবু নিয়মকানুন বাঁচিয়ে চলতে হবে — এই ভেবে তাঁরা চেষ্টা করলেন যোয়ানকে দিয়ে অভিযোগের সত্যতা কবুল করিয়ে নিতে।

এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দিনের পর দিন চলল যোয়ানের মন ও শরীরের ওপর অকথ্য অত্যাচার। প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে তাঁকে ঘায়েল করার জন্য কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা!

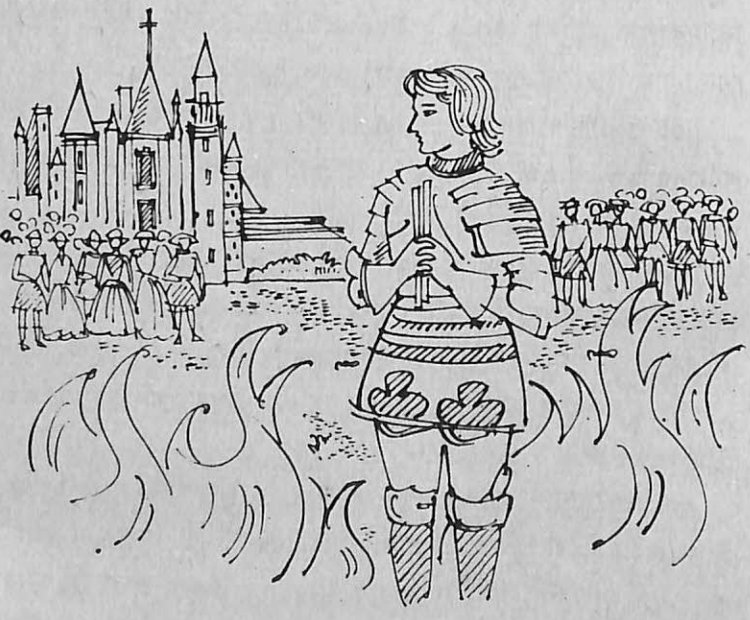
কিন্তু যোয়ান তাঁর উঁচু মাথা কিছুতেই নত করছেন না। তিনি জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করেননি ; ঈশ্বরের বাণীই তো তিনি প্রচার করে গেছেন। যা কিছু করেছেন তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্দেশেই তিনি করেছেন। সমাজ ধর্ম অথবা দেশের প্রতি ক্ষতিকর এমন কোনও কাজ তিনি করেন নি।

পাদ্রীরা যোয়ানকে দিয়ে কবুল করাতে না পারলেও হাল ছাড়েন নি। এবার তাঁরা পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর ওপর দায়দায়িত্ব চাপালেন। বন্দিনী অবস্থায় যোয়ান যাঁদের হেফাজতে থাকতেন, তাঁরা এবার শুরু করলেন চরম অত্যাচার, এমনকি দৈহিক নির্যাতনও। কিন্তু

যোয়ান তাঁর সঙ্কল্পে অটল। মিথ্যার কাছে, ভয়ের কাছে কোন অবস্থাতেই পরাভব মানবেন না তিনি।

শেষ পর্যন্ত কবুল করাতে না পারলে বিচারকমণ্ডলী যোয়ানকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। প্রাণদণ্ড দিতে পারলে তাঁরা আরো খুশি হতেন। কিন্তু বাধা এল যোয়ানের কাছ থেকেই।

বিচারের শেষদিন! একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে তিনি যা বলেছিলেন—বিচারকদের মতে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, কিছু কিছু ভুল ত্রুটি তিনি করেছেন। এই তথাকথিত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বেশি দণ্ড দেওয়া গেল না। তাই তৎক্ষণাৎ 'প্রাণদণ্ড' উচ্চারণ করা সম্ভব হয়নি।



যোয়ানের শত্রুপক্ষীয়রা কিন্তু তখনও হাল ছাড়েননি। ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে তাঁরা এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, এই দণ্ডই শেষ দণ্ড নয়।

যেমন কথা তেমন কাজ।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ ছিল যে, পুরুষ বেশে সজ্জিত যোয়ান ঘোরতর অধর্মোচিত কাজ করেছেন। বিচারের রায়ে বলা হল যে, ভবিষ্যতে তিনি পুরুষের পোশাক পরিহার করে চলবেন। কিন্তু যোয়ান এ নির্দেশ জেলখানায় মেনে চলেননি। এই নিয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার অভিযুক্ত করা হল। অথচ বন্দীশালায় তাঁকে যে সব পোশাক সরবরাহ করা হত তা স্ত্রীলোকের পোশাক নয়, পুরুষেরই পোশাক। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে পুরুষের পোশাক পরতে হয়েছিল। কিন্তু এসব যুক্তিতে কর্ণপাত করলেন না বিচারকমণ্ডলী, কারণ গোটা ব্যাপারটাই ছিল সাজানো।

এবার বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৪৩১ সালের ৩০শে মে তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। জীবনের শেষ মুহূর্তে যোয়ান ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতীক একটি চাইলেন। ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীরা এই শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর অধীনস্থ এক সৈনিক পুরুষ তাঁর হাতে তুলে দিলেন দু'টি কাঠের টুকরো। পরম ভক্তিভরে তাই কপালে বুকে ঠেকালেন যোয়ান। ততক্ষণে একটু দূরে তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে কাছাকাছি গির্জা থেকে নিয়ে আসা একটি ক্রুশ। এই ক্রুশের দিকে দু'টি চোখ কিছুক্ষণ রেখে চোখ বন্ধ করলেন যোয়ান! মুহূর্তের মধ্যে আগুনে আত্মাহুতি দিলেন এই বীরাঙ্গনা। তাঁর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল— কিন্তু হৃদপিণ্ডটি আগুনে ঝলসে যায়নি।

যাঁর অদৃষ্টে পাওনা ছিল সমগ্র ফরাসী দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা, তাঁকেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে আগুনে আত্মাহুতি দিতে হল, একের পর এক কতকগুলো মিথ্যা অভিযোগে! অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর পরিহাস!

কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম, দরিদ্র পরিবার। লেখাপড়ার সুযোগও

তেমন জোটেনি জীবনে। অল্প বয়স থেকেই তিনি বলতেন যে, তিনি শুনতে পান তাঁর অন্তরের নির্দেশ, ঈশ্বরের বাণী ঝঙ্কৃত হয় তাঁর উপলব্ধিতে। কেউ আমল দিত না তাঁর কথায়। কিন্তু এ বিষয়ে যোয়ানের এতটুকুও সংশয় ছিল না।

ফ্রান্সে তখন চরম দুর্দিন। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে কতবার পরাজিত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের আধাআধি তখন ইংরেজদের দখলে। ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্ল্‌স্‌ ছিলেন বিকৃতমস্তিষ্ক। রাজ্যের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এ অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের আক্রমণ প্রতিহত করা ফরাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফ্রান্সের অভিজাত পরিবারের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব—কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইংরেজ পক্ষ সমর্থন করছিলেন।

ফ্রান্সের এই চরম দুর্দিনে ডোমরেমি গ্রামের কৃষকদুহিতা যোয়ান এগিয়ে এলেন দেশকে রক্ষা করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে—হাতে তাঁর অস্ত্র, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, স্বদেশ উদ্ধারের কঠিন কর্তব্য তিনি সম্পাদন করতে চলেছেন ঈশ্বরের নির্দেশে। তিনি শুনতে পেলেন ঈশ্বরের আদেশ— 'পুরুষের পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তুমি যুবরাজ চার্ল্‌স্‌-এর নেতৃত্বে দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়।'

ঈশ্বরের নির্দেশের প্রতি তাঁর এমনি অকুণ্ঠ বিশ্বাস যে, আপাততঃ যা অসম্ভব যোয়ান তাকেই সম্ভব করে তুললেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যোয়ানের নেতৃত্বে ফরাসী ঘাঁটিগুলি একে একে ইংরেজ বাহিনীর অধিকার থেকে মুক্ত করা হল। একের পর এক অনেকগুলো ঘাঁটি দখল করার পর রীমস্‌ ক্যাথিড্রেল-এ পূর্ণ মর্যাদায় নতুন রাজা সপ্তম চার্ল্‌স্‌-এর সিংহাসন আরোহণ পর্ব মহা-আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ঈশ্বর-নির্দেশের কার্যকারিতা প্রমাণ করলেন বীরাঙ্গনা যোয়ান।

অথচ ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! দেশোদ্ধার করলেন যিনি, একশ্রেণীর অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর চক্রান্তে তাঁকেই গ্রহণ করতে হল চরম দণ্ড! অবশ্য অনেক পরে ফ্রান্সের জনগণ তাদের পূর্বপুরুষদের আচরিত অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে যোয়ানকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদায়

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। চার্চ কর্তৃপক্ষও তাঁকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ আজও পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এই মহীয়সী বীরাঙ্গনাকে।

মধ্যযুগের কুসংস্কারের বলি যোয়ান অব আর্ক। যে যুগে যুক্তি পরাভব মানত কুসংস্কারের কাছে, ধর্মের নামে তথাকথিত রক্ষকরা সেদিন নির্বিচারে অধর্মের পথ বেছে নিতেন—সে-যুগের সক্রেটিস, যোয়ান, গ্যালিলিও সবাই পরবর্তী যুগের অগ্রদূত, মানব-মুক্তির পথিকৃৎ —অথচ প্রচলিত বিধি ব্যবস্থায় তাঁদের একদিন নিজের জীবন দিয়ে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল—ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাস॥

অন্যায়, অসত্য আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বস্ব, এমন কি, জীবন পণ করেও সংগ্রাম করে যাব—এমনি যাঁদের দুর্জয় সঙ্কল্প, তাঁরা আগুনে পুড়ে কিম্বা ফাঁসির মঞ্চে জীবন বলি দিলেও, মানুষের অন্তরে যুগযুগান্তর পেরিয়েও স্মৃতি অম্লান, অক্ষয় হয়ে থাকে। দেশকালের ব্যবধান সত্ত্বেও যাঁদের কীর্তিকে মানুষ সকৃতজ্ঞ অন্তরে পোষণ করার প্রেরণা লাভ করে, তাঁদের অন্যতম মধ্যযুগের ফরাসী তরুণী যোয়ান—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যিনি লাভ করেছেন কালজয়ী অমরত্ব।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

মস্ত বড় পণ্ডিত, এক কথায় বলতে গেলে বিদ্যাদিগ্‌গজ। দেশ জোড়া তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি পাঠ করেছেন— কাব্যশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় অধিকার। শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণ সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। পণ্ডিত সমাজে সকলেই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেন তাঁর নাম।

দেশের বিভিন্ন স্থানে যখনই কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে কোন সাংস্কৃতিক সভার অধিবেশন হয়, তখনই তাতে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন এই পণ্ডিতপ্রবর। শাস্ত্রের মীমাংসা কিংবা সাহিত্যের কোনও খুঁটিনাটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কের লড়াই হয়, তাতে শেষ পর্যন্ত জয়লক্ষ্মী তাঁরই গলায় পরিয়ে দেন জয়মাল্য। বিদ্যার বহর আর খ্যাতির পরিধি দুই-ই সমানে বেড়ে চলেছে তাঁর। আর্যাবর্ত, পশ্চিম ভারত, দাক্ষিণাত্য সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি। তাঁর শিষ্যদের সংখ্যাও অগণিত। গুরুর সাহচর্যে থেকে তাঁরাও দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান।

একবার ঘুরতে ঘুরতে পণ্ডিত ও তাঁর দলবল এসে উপস্থিত হলেন নবদ্বীপ শহরে। তখন মুসলমান রাজত্ব। তবু সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্যের চর্চা চলছে অব্যাহত। বাংলার প্রধানতম শিক্ষাকেন্দ্র হল স্বনামধন্য নবদ্বীপ।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন-বার্তা নবদ্বীপের শিক্ষিত সমাজে সৃষ্টি করল এক বিরাট আলোড়ন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন সেখানকার পণ্ডিত সমাজ।

নবদ্বীপের টোলের এক তরুণ অধ্যাপকের মনে কিন্তু সেদিন দেখা গেল না কোনো আলোড়নের চিহ্ন। প্রতিদিনকার কাজকর্ম যেমন চলে সেদিনও কোনো ব্যতিক্রম হল না তাঁর। শিষ্যদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি — ভারতবিখ্যাত অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন নগরে — তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে আর আমাদের অধ্যাপক মশাই কিরকম নির্বিচার উদাসীন পুরুষ! কথাটা তরুণ অধ্যাপকের কানেও উঠল। ছাত্রদের ডেকে বললেন, হ্যাঁ, আগন্তুক পণ্ডিত সত্যিই বিদ্বান ব্যক্তি; তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে আমার ধারণা — তাঁর চরিত্রে বিদ্যা ও বিনয়ের কোনও সমন্বয় ঘটেনি। সুতরাং যত বড় বিদ্বানই হোন না কেন, ইনি নিতান্ত অহংকারী ও দুর্বিনীত। সুতরাং সত্যি কথা বলতে কি, এঁর সম্বর্ধনায় আমার তেমন উৎসাহ নেই! তবে হ্যাঁ, উনি যদি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহলে আমি সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাব।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একদিন সত্যিই এলেন তরুণ প্রিয়দর্শী এই অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে। সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা — গঙ্গার তীরে উন্মুক্ত স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত — তাঁকে ঘিরে তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্যমণ্ডলী। কাছেই বিনীতভাবে বসে আছেন তরুণ অধ্যাপক আর চতুষ্পাঠীর ছাত্ররা। কুশল আপ্যায়ন বিনিময়ের পর তরুণ অধ্যাপক বললেন: পণ্ডিতপ্রবর, আপনার প্রতিভার কথা লোকমুখে শুনেছি; আজ যদি সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ পেলাম, তাহলে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করুন।

পণ্ডিতপ্রবর বললেন : বেশ তো, কী বিষয়ের আলোচনা তোমার অভিপ্রায় ?

অধ্যাপক বললেন : আপনি পবিত্র পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে বসে আছেন — আপনার কাছ থেকে আপনার রচিত গঙ্গামহিমা স্তোত্র শুনতে চাই।

পণ্ডিতপ্রবর রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে নির্গত হতে লাগল শ্লোকের অবিরাম ধারা — গেঁথে চললেন তিনি অপূর্ব স্তব-স্তুতির-মালা। শব্দের ঝঙ্কারে, ভাবের বৈচিত্র্যে, সুরের গতিতে ভরে উঠল গঙ্গাতীরের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ। সৃষ্টি হল অপূর্ব উন্মাদনা শ্রোতাদের মনে। প্রহরকাল উত্তীর্ণ হবার পর পণ্ডিত ক্ষান্ত হলেন — তাঁর চোখে-মুখে আত্মশ্লাঘার সুস্পষ্ট চিহ্ন — শ্রোতাদের মনে সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

তরুণ অধ্যাপকটি এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন : পণ্ডিতপ্রবর, আপনাকে ধন্যবাদ ! শব্দশাস্ত্রের ওপর আপনার অসাধারণ অধিকার। কাব্যরসও আপনার অধিগত। কিন্তু তাহলেও আমি সবিনয়ে বলব, আপনার রচিত একটি শ্লোকে আমি ভাষা-বিজ্ঞান ও ছন্দ-লয়ের মাত্রা অতিক্রান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত পেয়েছি।

সকলে বিস্ময়ে হতবাক! প্রহরকাল ধরে স্বরচিত শ্লোকের পর শ্লোক নির্গত হয়েছে পণ্ডিতপ্রবরের কণ্ঠ থেকে — তারই মধ্যে একটি শ্লোকের মধ্যে ভাষাগত ত্রুটির উল্লেখ করছেন এই অধ্যাপক কি করে ? পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বললেন : যিনি শ্রুতিধর তাঁর মনের পটে সব কিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে আঁকা হয়ে যায় — তাই আমার সব ক'টি কথাই মনে রয়েছে।

তারপর পণ্ডিতের আগ্রহে সেই শ্লোকটি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা শুরু করলেন তরুণ অধ্যাপক — প্রতিটি কথা, প্রতিটি পংক্তি, বিশ্লেষণ করে দেখালেন কোথায় কি ভাবে ত্রুটি ঘটেছে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে, কোথায় ভাষা-তত্ত্বের দিক থেকে যথাযথ



নিয়ম পালিত হয়নি।

পণ্ডিত অধোমুখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। অধ্যাপকের বক্তব্য যথার্থ, তাঁর যুক্তি অকাট্য। তিনি এগিয়ে এসে দু' হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে, আলিঙ্গন করলেন তরুণ অধ্যাপককে, আর বললেন: আমি নিজের বিদ্যা সম্পর্কে অহঙ্কার বোধ করেছি এতদিন, আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে আমার সেই অহঙ্কার চূর্ণ হল।

বিদ্যাগর্বী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্টকে সেদিন পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল যে প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকটির কাছে — তিনি বাংলার গৌরব নিমাই পণ্ডিত ভবিষ্যতের শ্রীচৈতন্যদেব।

জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর — এ
বাণীটি যাঁর ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করে মূর্তিমতী হয়ে উঠেছিল

তিনি ঈশ্বরসেবী নন, তিনি ঈশ্বরের অবতার। জ্ঞানতপস্বী-রূপে সিদ্ধিলাভ করেও জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন বহু উর্দ্ধে। জড়তাগ্রস্ত মানুষের চৈতন্য উদ্বোধিত করার জন্য ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন মর্ত্যলোকে শ্রীচৈতন্যরূপে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের শাস্ত্রে বলে চেষ্টা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারে মানুষ। আজকের দিনে একথার সত্যতা তো প্রতিনিয়তই প্রমাণিত হচ্ছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আজ মানুষের অবাধ গতি। মহাকাশও আজ মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়। কিন্তু এ তো হল সঙ্ঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফল। বহু মানুষের বহুদিনের শ্রম, জ্ঞানচর্চা আর রাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থন — এই সব মিলে আজ বিশ্ব ও মহাবিশ্বের রহস্যভাণ্ডারের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে। এই সাফল্যের মূলে রয়েছে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র-পরিচালিত সঙ্ঘবদ্ধ অনলস প্রয়াস! যাঁরা এই প্রয়াসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, তাঁরা সকলেই এর কৃতিত্বের অংশীদার।

কিন্তু সাধারণ তোমার-আমার মতো মানুষের কথা ধরা যাক। সঙ্ঘবদ্ধ কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার সুযোগ পেলো না যারা, কিংবা রাষ্ট্র তার সর্বাত্মক সাহায্য নিয়ে যাদের সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়ে এলো না, তাদের সংখ্যাই তো ষোলোর মধ্যে পনেরো আনা — আমরা তোমরা আর একশোর মধ্যে নিরানব্বুই জনই এই দলে। কিন্তু আমাদের জন্যই তো প্রত্যয়শীল শাস্ত্রবাক্য — চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।

সেকালের প্রামাণ্য পুঁথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে শ্রুতিধর আর স্মৃতিধরের কথা। একবার যা পড়বেন অথবা একবারমাত্র যা কান দিয়ে শুনবেন, তা চিরকালের জন্য তাঁদের স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে থাকবে। পরীক্ষাচ্ছলে কেউ যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাঁরা নির্ভুল ভাবে বলে দেবেন চোখ দিয়ে যা পড়েছেন সেই কথার পর কথা, লাইনের পর লাইন, কিংবা কান দিয়ে যা শুনেছেন, সেই শোনা কথাগুলোর প্রতিটি খুঁটিনাটি কথা। এঁরাই হলেন শ্রুতিধর আর স্মৃতিধর। নমস্য ব্যক্তি তাঁরা, কিন্তু তাঁদের দেখা কদাচিৎ মেলে—যাঁরা দেখেছেন এই রকম প্রতিভাবান ব্যক্তি, তাঁদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

কিন্তু ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা পাওয়া যায় বলেই তো ভরসা হয় যে, মানুষের মধ্যে এমনি প্রতিভার বিকাশ অসাধারণ হলেও অসম্ভব নয়। এমনি এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী জগদ্‌বরেণ্য মহাপুরুষের কথা বলছি।

কিছুদিন হল বেলুড় মঠে Encyclopaedia Britannica জ্ঞানকোষ এক সেট এসেছে। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাঁধানো বই, গায়ে সোনার জলে নাম লেখা—দেখলেই হাতে নিতে ইচ্ছা হয়। একটি দুটি খণ্ড নয়—পর পর চব্বিশটি খণ্ডে পরিকল্পিত এই বিরাট গ্রন্থে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। মঠের যে ঘরখানিতে বইপত্র রাখা হত, সেই ঘরে বইগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বামীজী—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর পাশে তাঁর পরম অনুগত শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। শরৎচন্দ্রের লোভাতুর দৃষ্টি বইগুলোর দিকে আকৃষ্ট হল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মুখে-চোখে ভেসে উঠল একটু অসহায় ভাব—স্বামীজীকে লক্ষ্য করে শিষ্য বললেন : এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।

স্বামীজীর মুখে দেখা গেল সকৌতুক হাসির ছটা। বললেন : কি বলছিস ? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, সব বলে দেবো। শিষ্য তো অবাক—এই তো সবেমাত্র কয়েকদিন বইগুলি এসেছে, তাছাড়া স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। ক'দিন



থেকে তাঁর পীড়ার প্রকোপ বেড়ে গেছে — এমনিতেই অসুস্থ দেহ — অথচ স্বামীজী বলছেন — যা খুশি জিজ্ঞাসা করতে। অবাক হয়ে শিষ্য প্রশ্ন করল : আপনি কি এরই মধ্যে এইসব বইগুলো পড়েছেন ?

স্বামীজী বললেন : না পড়লে কী অমনি বলছি ?

এবার গুরু-শিষ্যের পাট কিছুক্ষণের জন্য পাল্টে গেল। শিষ্য পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা। গুরু প্রশ্নের উত্তরদাতা। একের পর এক বই খুলে কঠিন কঠিন বিষয় বেছে নিয়ে শিষ্য ছুঁড়তে লাগলেন প্রশ্নবাণ। আশ্চর্য ব্যাপার! স্বামীজী সেইসব প্রশ্নের যা যা উত্তর দিলেন, তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে বই-এর লিখিত বিষয়বস্তুর। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে স্বামীজী যে ভাষায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন তা একেবারে হুবহু বই-এর ভাষা। পর পর দশখানি বই থেকেই প্রশ্ন করলেন শিষ্য। গুরু অবলীলাক্রমে সেইসব প্রশ্নের জবাব দিলেন — বইতে যেমনটি লেখা রয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে। পরীক্ষাপর্বের শেষে শিষ্য তো

ব্যাপার দেখে হতবাক—তবু কোন রকমে বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে বললেন দু'টি মাত্র কথা—এ মানুষের শক্তি নয়। কিন্তু এইখানেই তো শিষ্য ভুল করলেন। এই শক্তির পিছনে নেই ম্যাজিক; এর সবটাই লজিক। সেই কথাটি বুঝিয়ে দিলেন স্বামীজী—'দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেল।'

অঙ্কের হিসাবে জীবনের পরিমাপ নিতান্ত স্বল্প—তাছাড়া শুষ্ক জ্ঞানচর্চার রাজ্যে বিচরণ করার মোহমুক্ত পুরুষ পেয়েছেন পরমপুরুষের চরম প্রসাদ, উপলব্ধি করেছেন বেদান্তের মূল সত্য—উপলব্ধ সত্যটিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি দেশ-দেশান্তরে। ভারতবর্ষের সীমা পেরিয়ে ভারত-আত্মার শাশ্বতবাণীকে তিনি বহন করে নিয়ে গেছেন সমুদ্রপারের বিদেশে। সংগঠনের কাজে, সত্যধর্ম প্রচারের ব্রতে উৎসর্গিত করেছেন তাঁর সমস্ত দেহ মন, সমগ্র সত্তা জীবন।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অসময়ে তাঁর কর্মভারাক্রান্ত দেহে ঘটেছে ব্যাধির প্রকোপ—তবু কর্মচক্রকে তিনি প্রতিনিয়ত করে চলেছেন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। তাঁর মধ্যে ঘটেছিল জ্ঞান ও কর্মের বিস্ময়কর সমন্বয়।

অবসর-বঞ্চিত জীবন, কর্মশক্তির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, দেশ-দেশান্তরে প্রসারিত তাঁর কর্মচক্রের পরিধি, নিজের হাতে গড়ে তোলা মিশনের সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যা—তবু তারই মধ্যে জীবনের অবসরের ক্ষণ-মুহূর্ত গুলোকে তিনি ভরিয়ে তুললেন জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার থেকে আহৃত রত্নখণ্ডের সাহায্যে। জ্ঞানসাধনায় মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচয়লাভে ছিলেন তিনি আগ্রহশীল—তাই Encyclopaedia Britannica-র জ্ঞান আহরণ করার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা—আর সেই আকাঙ্ক্ষাটি পরিতৃপ্ত করার যে উপায় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, সেই উপায়টি মানুষের পক্ষে আয়ত্ত

করা দুঃসাধ্য নয় — এই কথাটিই তিনি প্রমাণিত করে গেলেন নিজের আচরণ দিয়ে।

একক মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রেও সাফল্যের পথ দুরতিক্রম্য হলেও অনতিক্রম্য নয়।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। গৈরিক-পরিহিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আহ্বান — সেদিন নূতন আশা ও বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করেছিল পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে — পরাধীন ভারত-সন্তানের কাছে তারা লাভ করেছিল মহান মুক্তির নির্দেশ। অসাধারণ প্রতিভা আর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহাপুরুষের মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের ঘটেছিল এক বিস্ময়কর সমাবেশ।

সম্রাট নেপোলিয়ন

ফরাসী দেশের বুলোন অঞ্চলে সেদিন লোক আর ধরছে না। এরা সকলেই ঝকঝকে তকতকে পোশাক পরা সামরিক-বাহিনীর লোক। শহরে, গ্রামে কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই, তাঁবুতে আর ছাউনিতে ঢেকে গিয়েছে। সবার মুখেই উৎসাহ আর দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রায় গোটা ইয়োরোপ তারা জয় করেছে, বাকি শুধু ইংল্যাণ্ড। বুলোন থেকে সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ডের দূরত্ব খুব বেশি নয়—একবার সমুদ্র পথটি অধিকার করতে পারলে ফরাসী সৈন্যের গতিরোধ করা আর ইংরেজের সম্ভব হবে না, একথা ফরাসীরা যেমন জানে, ইংরেজরাও প্রায় ততখানিই বুঝতে পেরেছিল—তাই দু' পক্ষ থেকে চলেছিল জীবন-মরণ সংগ্রামের তোড়জোড়।

সামরিক আয়োজনের তোড়জোড়ে ফরাসী এবং ইংরেজ উভয় উপকূলের অধিবাসীদেরই হয়েছে সব চেয়ে বেশি অসুবিধা। এতদিন তারা শান্তিপূর্ণভাবে যেরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল, সেটি আর সম্ভব হচ্ছিল না। সমুদ্রে মাছ ধ'রে, কিম্বা ছোটখাটো জিনিসপত্র চালান দিয়ে, যারা জীবিকা অর্জন করত—তাদেরই হয়েছিল বেশি ক্ষতি।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে। তাই কখনও কখনও মরিয়া হয়ে তারা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ছোট ছোট নৌকোয় তাদের সওদা নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে পড়ত সমুদ্রের বুকে। ফরাসী দেশের অনেকেই এইসব পণ্য কিনে নিয়ে যেত।

একদিন একটা পালতোলা ছোট্ট নৌকো ইংল্যাণ্ডের উপকূল থেকে পশ্চিম দিকে সমুদ্রের জল কেটে তরতর করে ভেসে আসতে দেখা গেল। মাত্র একজন আরোহী কুড়ি-একুশ-বছর বয়স। অনেকখানি আশা আর আকাঙ্ক্ষা তার মনে। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে যখন যুবক ঠিক মাঝ-দরিয়ায় এসে পড়ল, তখন হঠাৎ দু'দিক থেকে দু'টি নৌকো ঘিরে ফেলল তার ছোট্ট নৌকোটি — বাধাদানকারী নৌকোর লক্ষ্য তার পণ্য নয় — সে নিজে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তরুণ একথা বুঝতে পারল। আগন্তুকরা ফরাসী সামরিক-বাহিনীর কর্মচারী। তারা তরুণটিকে বন্দী করে নিয়ে গেল বুলোনের ঊর্ধ্বতন সামরিক বিভাগে। ফরাসীদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য শত্রুর গুপ্তচর হয়ে এসেছে — এই সন্দেহে তাকে কারাগারে রাখা হল। সেখানে আরো অনেক ইংরেজবন্দীকে দেখতে পেল ধৃত তরুণটি।

বন্দীদের যে কারাগৃহে রাখা হয়েছিল, তারই আশপাশের খোলা জায়গা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা ছিল। এই জায়গাটুকুই তাদের বন্দী জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। এখান থেকেই তারা দেখতে পেত নীলাকাশ, শুনতে পেত সমুদ্রের আহ্বান। এদের ওপর পাহারার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। জাহাজ ছাড়া পালাবার কোনো উপায়ই ছিল না এদের। তাই অনেক সময় স্বাধীনভাবে উপকূল পর্যন্ত চলাফেরা করলেও কেউ বড় একটা আপত্তি করত না। বন্দীরা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে চাইত স্বদেশের তটভূমি। সমুদ্রে ঢেউ-এর ওপর ঢেউ-এ আছাড় খেয়ে ফিরে আসত তাদের দৃষ্টি, ইংল্যাণ্ড থাকত দৃষ্টির বাইরে, মনের ভিতরে।

যে তরুণটিকে কিছুদিন আগে বন্দীশালায় নিয়ে আসা হয়েছিল, তাকে অনেক সময় দেখা যেত — সমুদ্রের উপকূলে — তার চোখে উদাস দৃষ্টি, সকলের সঙ্গ এড়িয়ে চলত সে, আপন মনে বসে থাকত সমুদ্রের ধারে।

একদিন কিন্তু তাকে তার অভ্যস্ত জায়গাতে দেখা গেল না। সান্ত্রীদের কঠিন দৃষ্টির বাইরে একটা ঝোপের আড়ালে সে দাঁড়াল। কয়েকদিন আগে সমুদ্রের ভাটায় ভেসে আসা কাঠের একটা পিপে সবার অলক্ষ্যে সে রেখে দিয়েছিল। ক'দিন থেকে সে প্রতিদিনই সবার দৃষ্টি এড়িয়ে পিপেটাকে একটা ছোট নৌকো তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। তৈরি করার যন্ত্রপাতি তার কাছে কিছুই ছিল না, তবু ক্রমাগত চেষ্টায় তৈরি করে ফেলল একটি ছোট নৌকো। পাল, হাল প্রভৃতি অন্য কোনো কিছুই অবশ্য যোগাড় করা গেল না। তবু এই নৌকো নিয়েই ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে প্রস্তুত হল।

এবার একদিন রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে নৌকোয় উঠে ভেসে পড়ল সে। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই তীর থেকে শোনা গেল রুক্ষ কণ্ঠস্বর : কে ওখানে ? সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো পড়ল নৌকোয়।

আবার বন্দী হল তরুণ !

পরদিন তার বিচার।

বিচারাসনে রয়েছেন স্বয়ং ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

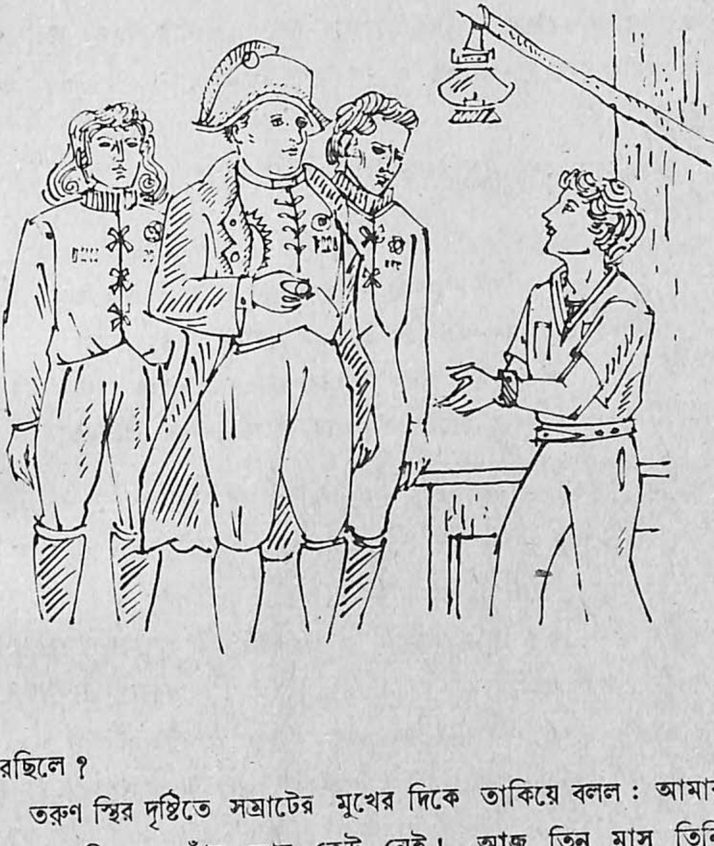
তরুণকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কোথায় পালাবার চেষ্টা করছিলে ?

— আমার দেশ ইংল্যাণ্ডে — নির্ভীক কণ্ঠস্বর তরুণের

— এই নৌকোয় তুমি দীর্ঘ সমুদ্র-পথ যেতে পারবে — সে-কথা কি করে ভাবলে ?

— আমাকে যেতেই হবে।

— কেন যেতে হবে, কে আছেন যাঁর জন্য তুমি নিজের জীবন বিপন্ন



করছিলে ?

তরুণ স্থির দৃষ্টিতে সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : আমার মা ! আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই ! আজ তিন মাস তিনি আমার খবর পাননি, তাই নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও শুধু মাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় আমি পালাতে চেষ্টা করছিলাম। আমার অপরাধ হয়েছে শাস্তি দিন !

সম্রাট মুহূর্তকাল কি ভাবলেন, তারপর তাঁর প্রধান সহকারীকে ডেকে কি যেন বললে। তারপর পকেট থেকে তাঁর নামাঙ্কিত একটি মোহর বার ক'রে তরুণের হাতে দিয়ে বললেন : তোমার জাহাজ প্রস্তুত, তুমি দেশে তোমার মায়ের কাছে যাও — তুমি মুক্ত।

তরুণ বিস্ময়ে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে রইল। বিচার কক্ষে যাঁরা

উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও পরস্পরের দিকে তাকালেন। সম্রাট আবার বললেন : তুমি দেশে পোঁছে তোমার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। মার জন্য যে ছেলে নিজের জীবন বিপন্ন করে — সে মা ধন্য, তিনি রত্নগর্ভা।

কৃতজ্ঞতায় তরুণের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

অত বড় সম্রাট বিশ্ববিজয়ী বীর — তাঁর বিজয়-রথের চক্রতলে নিষ্পেষিত হয়েছে অগণিত মানুষ। রক্তপাত আর হিংসার তাণ্ডবে সায় দিয়ে এসেছেন বরাবর — তবু লৌহ-কঠিন এই মানুষটি সেদিন পরাভব মানলেন মায়ের কথা ভেবে দু ফোঁটা চোখের জল আর নিজের জীবন বিকিয়ে দেবার দুর্জয় নেশার কাছে।

শিবাজী ও নেতাজী

সামনা-সামনি লড়াই চলছিল বহুদিন ধরে। প্রায় গোটা ভারতবর্ষের অধীশ্বর ঔরঙ্গজীব বাদশাহ-দিল্লীশ্বর বা জগৎ-ঈশ্বর। অত দোর্দণ্ড প্রতাপ — লোক-লস্কর, সামরিক-বাহিনী — কোন কিছুর দিক থেকে ঘাটতি নেই। সে তুলনায় শিবাজীর শক্তি সামর্থ্য কতটুকু ? বাদশাহের চোখে সামান্য 'পার্বত্য-মূষিক' বহী তো নয়। তবু বাদশাহ্ বার বার তাঁর শক্তির হানি ঘটাতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন। বার বার বাদশাহী ফৌজ পাঠানো হচ্ছে — সেনাপতি বদল হচ্ছে, কিন্তু শিবাজীকে কাবু করা যাচ্ছে না।

এবার নতুন মতলব এল তাঁর মাথায়। তাঁর নির্দেশে নতুন সেনাপতি হয়ে এলেন জয়সিংহ। বাদশাহের একান্ত অনুগত রাজপুতবীর — সামরিক পরাক্রম আর কূটনীতিতে সমান দক্ষ। কিছুকাল লড়াই চালাবার পর জয়সিংহ বুঝলেন শুধু সামরিক শক্তি প্রয়োগে এই দুর্ধর্ষ মারাঠা বীরের শক্তিহানি ঘটানো সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি কূটনীতির শরণাপন্ন হলেন।

বাদশাহের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অনুমোদন নিয়ে তিনি

শিবাজীকে আহ্বান করলেন একবার বাদশাহের দরবারে হাজির হতে। বাদশাহ শুধু তাঁর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিই দেননি — তাঁর দরবারে তাঁকে প্রকাশ্যেও যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে, এমনকি উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সুস্থ পরিবেশে সম্মানজনক সন্ধিপত্রও স্বাক্ষরিত হবার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। শিবাজী এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

যথা সময়ে সশস্ত্র শিবাজী হাজির হলেন বাদশাহের দরবারে। কিন্তু যে আশা নিয়ে অতখানি দূর পথ অতিক্রম করে তিনি জয়সিংহের অনুরোধে এসেছিলেন, দরবারে তা পূরণের কোনও আভাসই তিনি পেলেন না। বরং বাদশাহের পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে শোনানো হল কিছু অপ্রীতিকর, এমনকি অপমানজনক কথা।

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ক্রোধে আর ঘৃণায় বার বার কেঁপে উঠছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি দরবারেই কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

যখন সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন তিনি আগ্রার প্রাসাদে বন্দী। বাদশাহের অনুমোদন ছাড়া তাঁর গতিবিধি নিষিদ্ধ করা হল।

শিবাজী বুঝলেন — এমনি ভাবে তাঁকে শক্তিহীন করার জন্যই বাদশাহ্ এই চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন।

শিবাজীও কম নন। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ — এই নীতি কার্যকর করার জন্য তিনি অনেক ভেবে চিন্তে এক মতলব আঁটলেন। তিনি প্রচার করলেন যে, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন — ক্রমে আরো জানানো হল যে, ব্যাধিমুক্তির জন্য তিনি সাধু সন্ন্যাসী ফকির সন্তদের কাছে ফল মূল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাদশাহ্ কিম্বা তাঁর পরামর্শদাতারা এ প্রস্তাবে আপত্তি করার কোনও কারণ দেখতে পাননি। সুতরাং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ফল, মিষ্টান্নের ঝুড়ি পাঠানো শুরু হল।



প্রথমে মন্ত্রীরা এগুলো মোটামুটি পরীক্ষা করে দেখত। কিন্তু দিনের পর দিন তারা আর তল্লাসের প্রয়োজন বোধ করল না।

এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিলেন শিবাজী। একদিন তিনি এবং পুত্র শম্ভূজী ফল মূলের বদলে দু'টি ঝুড়িতে নিজেরাই উঠে বসলেন। ঢাকাঢুকি দিয়ে ঝুড়ি দু'টো অন্যান্য ঝুড়ির সঙ্গে মিলে মিশে নির্বিঘ্নে ফটক পার হয়ে গেল।

তারপর পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছবার পর শিবাজী আর শম্ভূজী দু'জনেই যাত্রা করলেন আগ্রা ছেড়ে। শিবাজী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সোজা রাস্তায় না গিয়ে নানা অঞ্চল ঘুরে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন নিরাপদে নিজরাজ্যে। তাঁর পালিয়ে যাবার খবর বেশিদিন গোপন থাকেনি, কিন্তু বাদশাহের পুলিশ অথবা গুপ্তচর বাহিনীর পক্ষে তাঁর

হদিস পাওয়া সম্ভব হয়নি।

এরপর যথা সময়ে শিবাজী আবার বাদ্‌শাহের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। ঔরঙ্গজীব শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিয়ে সন্ধি করলেন।

(২)

এমন আর একটি দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে গেল কিছুদিন আগে।

এই ঘটনার নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বিলেতের আই. সি. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তিনি সরকারী চাকুরি গ্রহণ না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুগামী সুভাষচন্দ্র সেদিন বাংলা তথা ভারতের তরুণদের প্রিয় নেতা। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালের পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে যতগুলি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তার সব ক'টির পুরোভাগে দেখা গেছে সুভাষচন্দ্রকে। দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর তাঁর দায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে স্থান করে নিলেন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব মহলে। শুধু কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেই নয়, সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভিযানের মাধ্যমে যাঁরা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলেছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও ছিল সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

দেশপ্রেমের জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছিল কারাবাস আর অন্তরীণের মাধ্যমে। সুদূর মান্দালয়ের কারাগারে আবদ্ধ রেখেও ইংরেজ সরকার তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেননি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অথবা সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য ইংরেজ সরকার যে কতবার কতভাবে কতবার তাঁকে কারারুদ্ধ করেছেন, তার সীমা সংখ্যা নেই বললে চলে।

কিন্তু সরকারের নির্যাতন যতই তাঁর ওপর চলেছে, দেশবাসীর অন্তরে ততই তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে পরপর দু'বার নির্বাচিত করেছে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে। — জাতীয় মহাসভার সর্বোচ্য পদে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির মর্যাদায়। তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে 'দেশগৌরব' আখ্যায়!

১৯৩৮-১৯৩৯ সাল। ইয়োরোপে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য সুভাষচন্দ্রই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইয়োরোপ তথা সারা পৃথিবী শিগগিরই এক বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হতে চলেছে। এই মহাযুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন — আর এই সুযোগে ভারতবর্ষ এবং এশিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশগুলি যদি ইংরেজ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অখণ্ড শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ায় — তাহলে স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার পথে কোন বাধাই থাকবে না।

এই কারণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একদিকে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা যেমন আবশ্যক, ইংরেজ বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে তেমনি সম্মানজনক শর্তে সমঝোতার প্রয়োজন। শুধু অহিংস নীতির ওপর ভিত্তি করে ইংরেজ বিরোধিতাকে সফল করে তোলা সম্ভব নয় — এজন্য সশস্ত্র প্রতিরোধও অনিবার্য। এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট মত।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ চিরকালই গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা সুভাষচন্দ্রের মত ও নীতিকে গ্রহণ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি অকালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এরপর ইংরেজ সরকার আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করলেন। ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই ছিলেন তাঁদের নিরাপত্তার প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং সরকারী আদেশে কারা কবলিত হলেন সুভাষচন্দ্র।

বন্দী অবস্থাতেও সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিকল্পনা সার্থক করার গোপন চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। সে সময় বাংলার বিপ্লবীরাও কারারুদ্ধ। তাঁদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। বিপ্লব

আন্দোলনের কর্মী আর যাঁরা ধরা পড়েননি তাঁদের সঙ্গেও গড়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ। গোপনতার আশ্রয় নিয়ে বিদেশের সঙ্গেও যোগাযোগ অব্যাহত রইল। প্রতিবন্ধক শুধু একটাই — কারাগারে বন্দী অবস্থায় কি করে তাঁর পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হবে।

এরজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কারাগার থেকে মুক্তিলাভ। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব হবে? অনেক চিন্তা ভাবনার পর সুভাষচন্দ্র এক অসাধারণ পন্থা গ্রহণ করলেন। ইংরেজ সরকারের নীতির প্রতিবাদে তিনি ঘোষণা করলেন আমরণ অনশনের সঙ্কল্প। সুভাষচন্দ্রকে যাঁরা জানতেন তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে, একবার কোনও সঙ্কল্প করলে কোনো অবস্থাতেই তা থেকে বিচ্যুত হবেন না তিনি। ইংরেজ সরকারও তাঁর এই অদ্ভুত অনমনীয় মনোভাবের কথা জানতেন।

সুভাষচন্দ্র তখন রীতিমত অসুস্থ। এই অবস্থায় অনশন করলে তার ফল কি হতে পারে সেটা তাঁরা ভাল করেই জানতেন। এ কথাও তাঁরা আরো ভাল করে জানতেন যে, কারাগারে অনশনরত অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের জীবননাশ হলে কী তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে সারা দেশ জুড়ে। শেষ পর্যন্ত শর্তাধীনে সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তির আদেশ জারি করা হল।

সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন এলগিন রোডের বাড়িতে। তাঁর স্বাস্থ্য-হানির পরিমাণ দেখে আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়িতে চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টা কড়া পাহারা। সুভাষচন্দ্র কোন অবস্থাতেই পুলিশের অজ্ঞাতে বাড়ি থেকে বার না হতে পারেন সেদিকে কড়া সতর্ক দৃষ্টি।

এরই মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিকল্পনার শেষ ধাপে পেঁাছে গেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন— স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এবং নির্জনে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না তিনি, এমন কি বাড়ির আপনজনদের সঙ্গেও দেখা করবেন না। তিনি যে ঘরে অবস্থান করছিলেন সেখানে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর আহার্য পেঁাছে



দেওয়া হবে রান্নার লোকের মারফৎ। এই আহার্য দেওয়া এবং আহারের শেষে বাসনপত্র ফিরিয়ে নেওয়া—এই দুটি উপলক্ষ্য ছাড়া আর কোন কারণেই তাঁর ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। আসলে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সুভাষচন্দ্র এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

ততদিনে একান্ত সঙ্গোপনে গৃহত্যাগের পথ আয়োজন সম্পূর্ণ। ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে সকলের অলক্ষ্যে তাঁকে নিয়ে বাড়ির গাড়ি করে রাতদুপুরে যথাসম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন বাড়ির খিড়কী পথ দিয়ে। পুলিশ তো দূরের কথা, কাক পক্ষীও জানতে পারল না এই মহাভিনিষ্ক্রমণের কথা।

ততক্ষণে সুভাষচন্দ্র আর সুভাষচন্দ্র নন—ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর নাম পরিচয় জিয়াউদ্দিন। একটি ভিজিটিং কার্ড সঙ্গে নেওয়া

হল। তাতে লেখা ছিল—

MOHD. ZIAUDDIN B.A., LL.B.
Travelling Inspector
The Empire of India Life Insurance Co Ltd,
Permanent Address : Civil Lines, Jubbulpore

সঙ্গের অ্যাটাচি কেসে দু'কপি কোরাণ। সুভাষচন্দ্রের ছদ্মবেশ নিখুঁত। উত্তর ভারতের মুসলমান মৌলভির বেশ। নেহাৎ কাছের লোকদেরও তাঁকে সুভাষচন্দ্র বলে চিনতে পারার সম্ভাবনা কম।

১৭ই জানুয়ারি ১৯৪৬। রাত ১—৩০মিঃ। বাড়ি থেকে বার হবার মুখে শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রী ইলার কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বললেন : God Bless You!

একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে—অক্টারলোনী মনুমেণ্ট পেছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চললে—তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে—তাই পথে ঘাটে পাহারা। হাওড়া বেলুড় বালি উত্তরপাড়া চন্দননগর—(এখানে ভয় ছিল পুলিশ তল্লাশী করবে না তো ?)

রাত ভোর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল পেরিয়ে বরাকর ব্রিজ। এরপর গাড়ি এসে থামল ধানবাদের কাছাকাছি এক বাংলোর সামনে। যেখানে থাকেন বড়ভাই আর বৌদিদি। জিয়াউদ্দিন একটু আগে নেমে গেলেন। শিশির সোজা গাড়ি নিয়ে দাদার বাড়ি এসে জানালেন যে, তিনি রাঙাকাকুকে ছদ্মবেশে নিয়ে এসেছেন। সন্দেহ এড়ানোর জন্য তাঁর প্রকৃত পরিচয় কাউকে না জানিয়ে পাঠানের ছদ্মবেশে কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হচ্ছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই মৌলভির বেশধারী জিয়াউদ্দিনের আবির্ভাব।

তাঁকে বাইরের ঘরে বসতে দেওয়া হল। তারপর সন্ধ্যার পর দাদা-বৌদি আর শিশির গাড়ি নিয়ে বার হলেন গোমো স্টেশনের দিকে।

জিয়াউদ্দিন ইতিপূর্বে গৃহকর্তাকে সেলাম জানিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন

রাস্তায়। কিছুদূর গিয়ে রাস্তা থেকে গাড়ি তাঁকে তুলে নিল। তারপর যথাসময়ে গোমো।

ট্রেণ আসতে তখনও দেরি। পথে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে যখন ট্রেণের ঘণ্টা বেজে উঠল আর গাড়ি এসে থামলো স্টেশনের গায়ে, দীর্ঘদেহী জিয়াউদ্দিন এগিয়ে গেলেন দৃঢ় পদক্ষেপে। কুলি তাঁর লাগেজ তুলে দিল। সঙ্গী তিনজন দূর থেকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে প্রণাম জানালেন দুঃসাহসী অভিযাত্রীর উদ্দেশ্যে। কামনা করলেন তাঁর যাত্রা শুভ হোক, নিষ্কণ্টক হোক।

কাবুল, বার্লিন, জাপান, সিঙ্গাপুর, কোহিমা, আজাদহিন্দবাহিনী। আজাদ হিন্দ সরকার নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ক'টি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হয়েছিল—তার সূচনা ১৭ই জানুয়ারির এই রহস্যময় মহাভিনিষ্ক্রমনকে কেন্দ্র করে॥

একই স্রোতধারায় উৎসারিত দু'টি জীবনের গতি—দুর্বার, দুর্ধর্ষ। শিবাজী আর নেতাজী—ভারতবর্ষের ইতিহাসে অসাধারণ প্রাণবন্ত পৌরুষের উজ্জ্বলতম প্রকাশ। সামরিক দম্ভ আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্লজ্জ মূঢ়তার মুখোস খুলে দিয়ে এবং জ্বালিয়ে গেলেন জীবনের অনির্বাণ দীপ, কুটিল সাম্রাজ্যবাদী চক্র ভেদ করে যার দ্যুতির উত্তরণ ঘটল স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে। পরাধীন জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এ দুই মহামানব আজও ভারতবাসীর মনে প্রাণে অধিষ্ঠিত রয়েছেন অকৃত্রিম প্রীতি ও অপরিসীম শ্রদ্ধার আসনে।

গান্ধীজী

বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে ভারতবাসীকে গান্ধীজী সর্বান্তঃকরণে ভালবেসেছিলেন, যাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনাই ছিল যাঁর জীবনের সর্বক্ষণের ধ্যান, সেই গান্ধীজীর জীবনান্ত ঘটল তাঁর এক স্বদেশবাসীর নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলিতে। ইতিহাসের এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যাকে আমরা 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করেছি, যাঁর প্রস্তর কিংবা ব্রোঞ্জের মূর্তি ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে আমরা স্থাপন করতে কসুর করিনি — সেই জাতির জনকের আদর্শ থেকে আজ আমরা ক্রমশঃ বিচ্যুত হচ্ছি — এও আর এক রহস্য।

শ্রেণী বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ঘিরে এক পতাকাতলে সমবেত করে দেশব্যাপীর স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে গান্ধীজী সঞ্চার করেছিলেন গতি এবং ব্যাপ্তি। সেই আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে প্রবাস জীবনে গান্ধীজী সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ঘোষিত নীতি সম্পর্কে পর পর এমন কয়েকটি বিদ্বেষ-পূর্ণ তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন — ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে সংগ্রাম পরিচালনার সম্পর্কে একটি

সুনির্দিষ্ট রীতি ও কর্মসূচী গ্রহণে সেই সব অভিজ্ঞতা সহায়তা করেছিল।

এই সংগ্রাম পরিচালনার অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল সত্যাগ্রহের নীতি। এই নীতির প্রথম এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রচেষ্টা ঘটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধীজীর জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা তাঁর ভারতীয় রাজনীতির দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্বিতীয়বার ফিরে যাবার পর তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

একটানা তিনবছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটানর পর গান্ধীজীর মনে হয়েছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য মূল ভূখণ্ডের অধিকারীদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন খুব বেশি। এই কারণে তিনি কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন।



১৮৯৬ সাল। তখন গান্ধীজীর পরিচয় অনেকেরই অজানা। সে সময় কংগ্রেসের পুরোভাগে ছিলেন মডারেটপন্থী নেতারা। তাড়াতাড়ি দেশে পৌঁছবার তাগাদায় যে জাহাজটি প্রথম ভারতবর্ষে রওনা হচ্ছিল গান্ধীজী সেই জাহাজটিতেই যাত্রা শুরু করলেন। জাহাজের গন্তব্য কলকাতা। কলকাতার নেতাদের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয়ই ছিল না। তাই কলকাতায় না এসে তিনি গেলেন বোম্বাই-এ।

প্রথমেই দেখা করলেন মডারেট পার্টির নেতা ফিরুজশাহ্ মেহ্তার সঙ্গে। তারপর একে একে দেখা করলেন বাল গঙ্গাধর তিলক আর গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে। এঁদের সকলের কাছেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সমস্যা তুলে ধরলেন। তাঁদের মধ্যে গোখলেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন সব চাইতে বেশি।

এঁদের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে গান্ধীজী লিখেছিলেন — ফিরুজশাহ্ মেহ্তাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল হিমালয়ের মত বিরাট ব্যক্তিত্বের মানুষটির খুব কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব ছিল না। তিলক ছিলেন সমুদ্রের মত বিশাল আর অতল, গোখলে যেন গঙ্গানদী। একটি নৌকো সম্বল করেই যে কেউ সেখানে পাড়ি জমাতে পারত — আর সব সময় নৌকোও প্রয়োজন হত না। সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে পড়লেই গোখলে তাকে বুকে টেনে নেবেন — এই ছিল গান্ধীজীর বিশেষণ।

যাইহোক, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বোম্বাই-এ এক জনসভা আহূত হল। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন ফিরুজশাহ্ মেহ্তা। গান্ধীজী ভেবেছিলেন মৌখিক ভাষণের মাধ্যমে সমস্যার চেহারাটা তুলে ধরবেন। কিন্তু মেহ্তার তা অপছন্দ এবং তারই নির্দেশে লিখিত ভাষণ পড়লেন গান্ধীজী। ভারতবর্ষে এই প্রথম জনসভায় গান্ধীজী ভাষণ দিলেন। তিনি এত নিচু গলায় তাঁর লেখা পড়ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত সভামঞ্চে উপস্থিত অন্য এক ব্যক্তি তাঁর ভাষণটি পড়ে শোনালেন। তাঁর বক্তব্য যেমন যুক্তি-পূর্ণ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

গান্ধীজীর ইচ্ছে ছিল — লেখা এবং জনসভার মাধ্যমে সমস্যাটি ভারতবাসীর কাছে বিশদভাবে তুলে ধরবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হল না। যাঁদের মামলায় আইনজীবী হয়ে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন — তাঁদের জরুরী তাগিদে তাঁকে ফিরে যেতে হল আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়। এটি তাঁর দ্বিতীয় যাত্রা।

S. S. Courland-এর আরোহী হয়ে গান্ধীজী ডারবানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন ১৮৯৬ সালের ৩০শে নভেম্বর, সঙ্গে স্ত্রী কস্তুরবাঈ আর দু'টি সন্তান। গুজরাতী পোশাক ছেড়ে গান্ধীর নির্দেশে এঁরা পার্শি পোশাকে সজ্জিত হয়ে জাহাজে উঠলেন। জাহাজে যাত্রী সংখ্যা ২৫৫। যাত্রীর চেয়ে মালপত্রের ওজন বেশি।

আরব সাগরের দোলানিতে বেশির ভাগ যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একমাত্র গান্ধীজীই কাবু হন নি — অসুস্থ যাত্রীদের সেবা শুশ্রূষায় তাঁকে বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত ঝড়ের দাপট কাটিয়ে জাহাজ বন্দরে নোঙর করল। এখানে দেখা গেল আর এক ঝড়! এ ঝড় রাজনীতির ঝড়।

শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এবং তাদের তাঁবেদাররা বন্দরে জমায়েত হয়ে দাবী জানালেন — গান্ধী আর সহযাত্রী ভারতীয়দের কিছুতেই ডারবাণ-এ পদার্পণ করতে দেওয়া হবে না, তাদের নিয়ে জাহাজটিকে এখনি ফিরে যেতে হবে। Quarantine আদেশ জারির ফলে পাঁচদিন জাহাজটি আটক অবস্থায় রইল — কেউই বাইরে আসতে পারেননি।

এই পাঁচদিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই আবার জারি করা হল নতুন আদেশ। যে মেডিকেল অফিসার Quarantine-এর সমাপ্তি ঘোষণা করে যাত্রীদের নিরাপদ অবতরণের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সরকারী আদেশে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হল। তাঁর জায়গায় এলেন নতুন অফিসার। তিনি এসেই আরও এগার দিনের জন্য কোয়ারান-টাইন-এর মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন। আবার একগাদা বিধিনিষেধ। কারো জাহাজ ছেড়ে যাবার হুকুম নেই।

সরকারের পক্ষ থেকে এক মুখপাত্র জানিয়ে গেলেন — গান্ধী তাঁর অনুচরদের নিয়ে অবিলম্বে ভারতবর্ষে ফিরে যান এবং সরকারপক্ষ তাঁদের ফিরে যাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে রাজী।

কিন্তু গান্ধী এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষপর্যন্ত সরকার বুঝতে পারলেন যে, ভারতীয়দের অবতরণের পথে বাধাদানের কোন আইন সঙ্গত অধিকার সরকারের নেই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সরকারী মুখপাত্র শ্বেতাঙ্গ সমর্থনকারী জনতাকে জানালেন, ভারতীয়দের অবতরণের পক্ষে বাধাদান করা সরকারের সাধ্যায়ত্ত নয়।

এই ঘোষণার পর জনতা বন্দর এলাকা থেকে চলে গেলেও গান্ধী পরিবারের নিরাপত্তা সম্পর্কে তখনও সংশয়ের অবসান হয়নি। প্রথমে ভারতীয়রা ভেবেছিলেন রাতের অন্ধকারে গান্ধীজী গোপনে অবতরণ করলে তাঁকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পেঁ ৗছে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু গান্ধীজী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। অগত্যা স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় কস্তুরবা'কে এবং তাঁর দু'টি সন্তানকে নিরাপদে জাহাজ থেকে নামিয়ে গন্তব্য পথে পেঁ ৗছে দেওয়া হবে।

সন্ধ্যার দিকে যখন গান্ধীজী অবতরণ করেন তখন বিক্ষোভ দেখা দেয়নি। তিনি ও তাঁর সহযাত্রী যখন বন্দর এলাকার বাইরে একটি রিক্শা গাড়ির আরোহী হয়ে শহরের দিকে যেতে উদ্যত, সেই সময় তাঁরা তুমুল বিক্ষোভের সম্মুখীন হলেন। বিক্ষুব্ধ জনতার প্রচণ্ড আক্রমণে রিক্শা চালক উধাও হল। গান্ধীজীর সহচর তাঁকে জনতার আক্রমণ থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

অনেকক্ষণ ধরে চলল এই আক্রমণ — ইঁট, পাথর, পচা মাছ কিছুই বাদ গেল না। কয়েক ঘা চাবুকও চলল তাঁর পিঠে, মুখে — ঘাড়ের কাছে এক ক্ষত থেকে রক্তপাত শুরু হলো — মুখে পিঠে কালশিরা, ঠোঁট কেটেও রক্ত ঝরতে লাগল। আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে গান্ধীজীর প্রাণ সংশয় ঘটত।

সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট-এর স্ত্রী মিসেস আলেকজান্দার এই অমানুষিক দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পুলিশ থানায় জরুরী খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন — গান্ধীকে খুন করা হচ্ছে প্রকাশ্য রাজপথে — এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে গান্ধীজীকে পৌঁছে দিল পার্শি ব্যবসায়ী রুস্তমজীর বাড়িতে।

সেখানে প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষা চলছে, তখনও তিনি চিকিৎসাধীন। এমন সময় বিরাট মারমুখী জনতা রুস্তমজীর বাড়ির সামনে জমায়েৎ হল। তাদের দাবী — তাদের হাতে গান্ধীকে ছেড়ে দিতে হবে, নাহলে বাড়ি ভেঙে তারা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে গান্ধীকে।

হিতৈষীরা বুঝলেন ভয়ানক বিপদ। তাঁরা পরামর্শ দিলেন — ছদ্মবেশে গান্ধীজী দরজা দিয়ে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করুন। গান্ধীজী প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী হননি। ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রাণ বাঁচাবার প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি ওখানে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করলে তাঁর আশ্রয়-দাতা রুস্তমজী ধনে প্রাণে বিনষ্ট হবেন, তখন তিনি রাজী হলেন।

পুলিশ কনস্টেবলের-র সঙ্গে পোশাক বদল করে ছদ্মবেশে গান্ধীজী ত্যাগ করলেন তাঁর আশ্রয়স্থল। অনেকটা পথ ঘোরাঘুরির পর, বহু প্রাচীর ডিঙিয়ে, রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে গলে বা গুদামের বস্তার পাহাড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় একটি গাড়ি ভাড়া করে গান্ধীজী সোজাসুজি চলে এলেন পুলিশ চৌকিতে। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা এইখানেই তিনি অবস্থান করলেন — পরে জনতার ক্ষোভ প্রশমিত হওয়ার পর গান্ধীজী মিলিত হলেন তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে।

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই গান্ধীজী সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তীব্রতা হবে কতখানি। তবু পশুশক্তির কাছে পরাভব মানবেন না — আর এই শক্তিকে ঘায়েল করার প্রধান অস্ত্র হবে আত্মিক শক্তি — সত্যাগ্রহ ॥

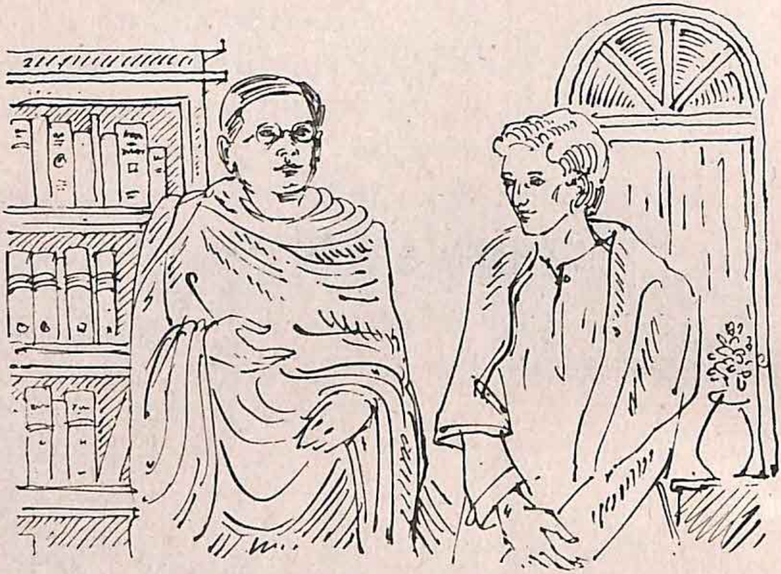
গান্ধীজী বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব। ভারতবাসীর কাছে তিনি 'জাতির জনক'। এই মর্যাদার আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জাতির স.ঙ্গ তাঁর আত্মীয়তার অধিকারে। বঞ্চিত আর শোষিতদের দুঃখকে তিনি অনুভব করেছেন নিজের অন্তরের গভীরে, সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যার সূচনা দক্ষিণ আফ্রিকায়, সমাপ্তি স্বদেশে, আবেদন মুক্তিকামী সমগ্র মানবজাতির কাছে। 'সত্যাগ্রহ' তাঁর কাছে রাজনীতির চাইতে মহত্তর ধর্মের, পুণ্যের অনুশীলন। জীবন ও বাণী যাঁর কাছে অভিন্ন সেই 'সত্যব্রত মহাত্মা'ই পুণ্যের তপস্যায় দীক্ষাদানের একক অধিকারী। তাই গান্ধীজীর আবেদন বিশ্বজনীন।

চিত্তরঞ্জন ও শ্রীঅরবিন্দ

বিলাতফেরৎ ব্যারিস্টার। সাহেবী কায়দা কানুন খুব ভাল ভাবেই রপ্ত করেছেন চিত্তরঞ্জন। কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ চালচলনে খাঁটি সাহেব হলেও—এই সাহেবীয়ানা ছিল একেবারেই বাইরের পরিচয়। আসল মানুষটি মনে প্রাণে ছিলেন ষোলো আনা বাঙালী। হয়তো বা সদ্য বিলাত থেকে ফিরে এসে বাইরের পরিচয়ে বাঙালীয়ানা ভাবটি সহজে চোখে ধরা পড়ত না। মনের চেহারা ক'জনের চোখেই বা ধরা পড়ে? মুষ্টিমেয় যে ক'জন সে চেহারাটি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা জানতেন—দাশ সাহেব আসলে নির্ভেজাল বাঙালী—তাছাড়া পরম বৈষ্ণব।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর কলকাতার হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু। পসার তখনও জমে ওঠেনি। ফিরে আসার পর দশ বছর কাটতে না কাটতে দেশের চেহারাটা একদম পালটে যেতে শুরু করল। প্রথমে দেখা গেল বাংলার আকাশে একটু করে কালো মেঘ—দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলার আকাশে—এরপর ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও।

সেদিনকার ঝড় উঠেছিল বিদেশী অত্যাচারী শাসকদের অন্যায়



নীতির বিরুদ্ধে—গোটা বাঙালী জাতির ধিক্কার থেকে। তখনকার বড়লাট কার্জন। ঝানু, ধুরন্দর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদের কেন্দ্রভূমি বাংলাদেশ। যে ভাবেই হোক ছলে বলে কৌশলে বাংলা ও বাঙালীর এই জাতীয়তাবাদের দুর্বার স্রোতের গতিরোধ করতেই হবে। নাহলে তার আবর্তে ভেসে যাবে ইংরেজ সাম্রাজ্য, ভরাডুবি হবে তাঁদের ভাগ্যের।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নেতারা এতদিন এই ভেবে নিজেদের মনে সান্ত্বনা লাভ করে এসেছেন যে, ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার দিয়ে পৌঁছে দেবে ভারতবর্ষকে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসনের নবযুগে। কিন্তু দেশের একদল মানুষের মনে হল, এ দৃষ্টিভঙ্গী অবাস্তব—আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ভারতবাসী কখনও তার অভীষ্টলক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। সে লক্ষ্য দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা নয়—সে লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা—ইংরেজ সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদ।

এই লক্ষ্যে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা আবেদন নিবেদনের পথ ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ, বিপ্লবের পথ। গোপন সমিতির মাধ্যমে ইংরেজ পুলিশ আর গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে এঁরা গঠন করলেন একের পর এক গোপন বিপ্লব সমিতি।

এঁদের প্রথম সারির নেতা অরবিন্দ। বাবা কৃষ্ণধন ছিলেন পুরোমাত্রায় সাহেব — ছেলেদেরও তিনি খাঁটি সাহেব ক'রে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। যখন শৈশব অতিক্রান্ত হয়নি — তখনই তিন পুত্র সন্তানকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন খাস লণ্ডন শহরে। সেখান থেকে ম্যাঞ্চেস্টার, কেম্ব্রিজ। কৃষ্ণধন সবচেয়ে বেশি আশা পোষণ করতেন তৃতীয় পুত্র অর্থাৎ অরবিন্দ অ্যাক্রয়ডকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করে ছেলে হোমরাচোমরা সাহেব হয়ে ফিরে আসবে — এই ছিল তাঁর দিন-রাতের স্বপ্ন।



অরবিন্দ আই. সি. এস্ পরীক্ষায় পাস করেও ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিতে রাজী হলেন না। এই অছিলায় ইংরেজ সরকার অরবিন্দকে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় যোগ দেবার সুযোগ দিলেন না। এতে কিন্তু অরবিন্দ একটুও অখুশি নন। ইতিমধ্যেই তিনি বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ছক মনে মনে এঁকে নিয়েছেন। বোমা আর পিস্তল নিয়ে ইংরেজ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে — এই তাঁর দুর্জয় সঙ্কল্প। দেশে ফিরে এই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অরবিন্দ। তাঁর প্রথম কর্মস্থল বরোদা, পরে কলকাতা।

ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ যজ্ঞে ইন্ধন যোগালেন কার্জন নিজে। বাংলার জাতীয়তাবাদের ধ্বংস সাধনের জন্য তিনি বেছে নিলেন বাংলা ব্যবচ্ছেদের অস্ত্র। এক অখণ্ড বাংলাকে জোর করে ভাগ করে দেওয়া হবে দু'টি পৃথক প্রদেশে। বঙ্গ বিভাগের এই পরিকল্পনা জানার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা ফেটে পড়ল তীব্র বিরোধিতায়। কার্জন তথা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল দু'টি। স্বদেশী আর বয়কট।

কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতাদেরও টনক নড়ল। বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। ইংরেজ সরকারের মুখোশ ছিনিয়ে নেবার জন্য বার হল একের পর এক পত্র পত্রিকা। 'বন্দেমাতরম্', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা'।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার কথাই বলি। এর সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। দারুণ জোরালো কাগজ। প্রত্যেকটি শব্দ এক-একটি জ্বলন্তস্ফুলিঙ্গ। ১৯০৭ সালের ১৩ই আগস্ট 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটির নাম — 'এখন ঠেকে গেছে প্রেমের দায়ে'। তীব্র জ্বালাময়ী ভাষা, খাপখোলা তরোয়ালের মত তীক্ষ্ণ। ইংরেজ অপসারণের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়ার পর ভারতীয়দের আহ্বান জানান হল বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য জীবনপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ুক বিপ্লবী আন্দোলনে ভারতবাসী মাত্রই — এই ছিল 'সন্ধ্যা' পত্রিকার নির্দেশ।

প্রবন্ধটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক অভিযুক্ত হলেন রাজদ্রোহের অভিযোগে। কোর্টে হাজিরা দিতে হবে, সেজন্য চাই আইনজ্ঞের সাহায্য। 'সন্ধ্যা'র হিতৈষীরা সোজাসুজি চলে এলেন নবীন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের কাছে। এক কথায় রাজী হলেন দাশ সাহেব। কিভাবে উপাধ্যায়কে জেল থেকে বাঁচানো যায় এই তাঁর একমাত্র চিন্তা।

উপাধ্যায় কিন্তু নির্বিকার। প্রকাশ্য আদালতে তিনি কবুল করলেন তিনিই প্রবন্ধের লেখক এবং পত্রিকার সম্পাদক। দাশ সাহেব বিচলিত হলেন। তখনও তাঁর একমাত্র চিন্তা কি করে ব্রহ্মবান্ধবকে জেল থেকে বাঁচানো সম্ভব হতে পারে। যখনই এই নিয়ে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন — ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে বলেছেন — আপনি কিছুমাত্র ভাববেন না। ইংরেজের সাধ্য নেই আমায় জেলে ঢোকানো। কিন্তু অপরাধী (?) যেখানে অপরাধ কবুল করেছে সেখানে তার অব্যাহতি কোথায়?

শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবান্ধবের ভবিষ্যৎবাণী নির্ভুল বলে প্রমাণিত হল। রায় দানের আগেই — ক্যাম্পবেল হাসপাতালে হার্ণিয়া অস্ত্রোপচার করার ফলে উপাধ্যায় প্রাণত্যাগ করলেন। ইংরেজ কারাগারে তাঁকে পদার্পণ করতে হল না।

এর কিছুদিন পর এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা হল চিত্তরঞ্জনের। ১৯০৮ সালের মে মাস। অত্যাচারী ইংরেজ শাসক কিংসফোর্ডকে বোমার সাহায্যে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়লেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দুই তরুণ — ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্লচাকী।

ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ — এই ভেবে প্রফুল্ল নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। ১লা মে। পরদিন মানিকতলার মুরারীপুকুরে এক বাগানবাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল ২৬জন বিপ্লবীদের একদলকে। এদের নেতা 'অরবিন্দ'।

শুরু হল আলিপুর বোমার মামলা। দীর্ঘদিন ধরে চলছে সওয়াল। আসামীদের পক্ষে মামলা পরিচালনায় এগিয়ে এলেন নামজাদা আইন ব্যবসায়ীরা। এঁদের মধ্যে যিনি প্রধানতম, তাঁর দৈনিক ফী হাজার টাকা। কোথায় জুটবে এত টাকা? শেষ পর্যন্ত এঁরা সরে দাঁড়ালেন। বিপ্লবীদের আত্মীয় শুভানুধ্যায়ীরা ঘোর চিন্তাগ্রস্ত। তাঁদের পক্ষ কে সমর্থন করবেন?

তাঁদের মনে পড়ল চিত্তরঞ্জন দাশের কথা। তখনও খুব নামজাদা নয়—তবুও বিপ্লবীদের শুভানুধ্যায়ী বলে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁকে অনুরোধ জানানো মাত্রই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। বিনা ফীতেই তিনি তাঁদের পক্ষ সমর্থন করবেন!

প্রথম যারা অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করে চিত্তরঞ্জন বললেন: 'আমি এ মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করব, একথা আমি আগেই জানতাম এবং সেজন্য আমি অনেকদিন আগেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন—কই একথা তো তাঁরা আগে কেউ ভাবেননি। প্রবীণ ব্যবহারজীবীরা যখন মামলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানালেন, তার আগে কেউ চিত্তরঞ্জনের কথা ভাবেননি। তা হলে?

প্রশ্নের জবাব দিলেন চিত্তরঞ্জন নিজেই।

গত কয়েকমাস ধরে তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে যে একটী বকুল গাছ দাঁড়িয়ে—তার কাছাকাছি খুব ঘন ঘন, পর পর কয়েকটি গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। চিত্তরঞ্জনের মনে হল কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই এই অঘটন ঘটছে।

বন্ধুদের নিয়ে তিনি প্ল্যানচেটে বসলেন। পর পর কয়েক দিন অশরীরীর একই কথা ভেসে এল তাঁর কানে—You must defend Aurobindo!

চিত্তরঞ্জন জানতে চাইলেন—কথাগুলো কে বলছেন?

উত্তর এল — উপাধ্যায় !

আবারও প্রশ্ন : উপাধ্যায়! কোন্ উপাধ্যায় ?

উত্তর এল : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। একবছর আগে যাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

অরবিন্দ এবং বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে যাঁরা অনুরোধ জানাতে এসেছিলেন, চিত্তরঞ্জনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে তাঁরা স্তম্ভিত। পরদিন থেকে কোর্টে হাজির হতে থাকলেন চিত্তরঞ্জন। মাসের পর মাস চলল মোকদ্দমা, বিনা ফী'তে মামলা চালিয়ে গেলেন চিত্তরঞ্জন। অন্য কোনও মামলা পরিচালনার সুযোগই ছিল না; সুতরাং রুজি রোজগার বন্ধ, ঋণের বোঝা বাড়তে লাগল। গাড়ি ঘোড়া বেচে দিলেন। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসের ছাঁটকাট চলল, তবু নির্বিকার চিত্তরঞ্জন। মামলার শেষ অবস্থায় বিচারপতি বীচক্রফ্‌ট্‌কে লক্ষ করে বললেন চিত্তরঞ্জন —

'অরবিন্দের বিচার শুধু যে আজ এই আদালতেই চলছে তা নয়। ইতিহাসের উচ্চতর বিচারালয়ে তাঁর বিচার হচ্ছে। এই বিচার উপলক্ষ্যে আমাদের এই তর্ক বিতর্ক একদিন নীরবতা লাভ করবে। কোলাহল থেমে যাবে। এই আন্দোলনের উত্তেজনাও একদিন হ্রাস পাবে। অরবিন্দও একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে মানুষ তাঁকে স্বদেশ প্রেমের কবি, জাতীয়তার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, মানবপ্রেমিক মহাপুরুষ বলে মানবে, তাঁর বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে, শুধু ভারতবর্ষেই নয় — সাগরপারের দূর দেশ-দেশান্তরে।'

চিত্তরঞ্জনের ভবিষ্যৎবাণী পুরোমাত্রায় সফল হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ আজ জগৎকীর্তিত মহামানব ॥

অরবিন্দ আর চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি আমাদের মনে আজো অমলিন। দু'জনেই ছিলেন দুর্জয় স্বদেশ-প্রেমের অধিকারী। দুজনেই পার্থিব সম্পদ অকাতরে নিয়োজিত করেছিলেন স্বদেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের দুষ্কর সাধনায়। অরবিন্দ

ছিলেন 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি'। দেশবন্ধু সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও ক্ষান্ত হন নি ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মরণে তিনি দান ক'রে গেলেন তাঁর 'মৃত্যুহীন প্রাণ'। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের আচরিত নীতি ভিন্নধর্মী হলেও তা' ছিল একই লক্ষ্যাভিমুখী। অরবিন্দ পরিণত বয়সে বেছে নিলেন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানব-জাতির সামগ্রিক কল্যাণ-সাধনার ব্রত ; দেশবন্ধু নিজেকে নিঃশেষে সমর্পিত করলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের সোপান রচনায়।

ছোটদের প্রিয় লেখিকা ইন্দিরা দেবী'র 'জীবন জ্যোতি কথা'য় ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিদের বর্ণময় জীবনের অংশবিশেষ রূপায়িত হয়েছে। ছোট অথচ অসাধারণ সব ঘটনা দিয়ে ভরা এঁদের জীবনকথা। আর সহজ ভাষায় লেখা সেসব কাহিনী গল্পের মত বলেছেন আকাশবাণী'র 'শিশুমহল' এর সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছোটদের কাছের জন ইন্দিরা দেবী। বুদ্ধ, কনফুসিয়াস থেকে সাম্প্রতিকতম মহান নেতা চিত্তরঞ্জন, শ্রী অরবিন্দের জীবন জ্যোতিতে ঝলমলে বইটি কিশোর মনের সঙ্গে বিরাটের পরিচয় করাবে সহজেই।

ওরিয়েন্ট লংম্যান

Rs. 12.00

Debi: Jiban Jyoti Katha

ISBN 0 86131 912 5